গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ১৯ - ২৫ জুলাই, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

সুপ্রিম কোর্টের রায় ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতার উপর প্রত্যক্ষ আঘাত

কোনও ব্যক্তির লোকসভা ও বিধানসভায় সদস্যপদ থাকা, না-থাকার প্রশ্নে এবং নির্বাচনে প্রার্থীপদ বাতিলের নতুন বিধান ঘোষণা করে ১০ এবং ১১ জুলাই ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কেন্দ্রীয় কমিটি ১৪ জুলাই নিম্নের বিবৃতি প্রকাশ করেছে।

"বিধানসভা ও লোকসভায় অপরাধী ব্যক্তিদের প্রবেশ বন্ধ করার দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্য ঘোষণা করে ১০ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৮(৪) ধারাকে অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছে, আদালতে সাজাপ্রাপ্ত এম এল এ এবং এম পি-রা সাজা ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই সদস্যপদ হারাবেন। ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে দুর্বৃত্ত ও অপরাধীদের নির্মূল করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের উদ্বেগের সাথে সহমত হয়ে একইসঙ্গে এ কথা বলাও অবশ্যকর্তব্য বলে আমরা মনে করি যে, এই সমস্ত মারাত্মক অপরাধীরা আইনসভার সদস্য হতে পারছে, তার কারণ বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষত ক্ষমতাসীন দলগুলি নির্বাচনে ভোটারদের ভয় দেখিয়ে, মস্তানদের পেশির জোর এবং টাকার থলির সাহায্যে যেনতেনপ্রকারেণ বেশি সংখ্যক আসন লাভের জন্য ক্রিমিনালদের আশ্রয় দিচ্ছে ও সযত্নে লালন-পালন করছে এবং তাদের এম এল এ-এম পি হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে, এমনকী গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পর্যন্ত করে দিচ্ছে।

এর পাশাপাশি এ সত্যও ভুললে চলবে না, খেটে খাওয়া মানুষের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে খর্ব করতে আন্দোলনের পরীক্ষিত নেতা-কর্মীদের সংসদ বা বিধানসভায় নির্বাচিত হওয়া আটকাতে সরকারি দলগুলি এঁদের বিরুদ্ধে শত শত মিথ্যা মামলা দায়ের করে। কোনও ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে সরকারি দলের মর্জি অনুযায়ী গণআন্দোলনের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে জেলে ভরা হয়। তাঁদের অনেকেরই মিথ্যা মামলায় দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসের শাস্তি হয়।

দুয়ের পাতায় দেখুন

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে — পৃঃ ৪

মিছিল-মিটিং বন্ধে শাসকরা এত উৎসাহী কেন

মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, নেতা-মন্ত্রীদের চুরি-দুর্নীতি, পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণ-লুণ্ঠন, সরকারি অপশাসনের মাত্রা যত বাড়ছে, তাকে কেন্দ্র করে মানুষের বিক্ষোভ যত বাড়ছে, তত্ই বাড়ছে প্রতিবাদ আন্দোলন সভা সমাবেশ মিছিলের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা। গণতন্ত্রের ভড়ংটুকুকে বাদ দেওয়া যায় না। তাই মিছিল সমাবেশ আন্দোলন চলবে না, সরাসরি এ কথা বললে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। অতএব, এমন চালাকির ব্যবস্থা কর, যাতে মিছিল-সমাবেশ করতেই না পারে। যেমন, মিছিল করতে পার, কিন্তু তা রাজপথে করা চলবে না। সমাবেশ করতে পার, তবে শহরের বাইরে কোথাও, নিদেনপক্ষে এক প্রান্তে, চুপিসারে। সরকার, পুলিশ-প্রশাসন আর আদালতের এক মিলিত চক্র ধারাবাহিকভাবে এই অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সহায়তা করছে কর্পোরেট মিডিয়া।

সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে ধর্মতলা-বিবাদী বাগ চত্বর এবং কলেজ স্কোয়ার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকাতে মিটিং-মিছিল বন্ধ করতে চেয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য এক বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে প্রস্তাব আকারে একটি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। কিছু দিন আগেই মেট্রো চ্যানেলে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দিয়েছেন, আইন-অমান্য আন্দোলনের অনুমতি দেবেন কি না, তিনি ভেবে দেখবেন। গত ২৫ মে হঠাৎ কলকাতার পুলিশ কমিশনার লালবাজারে এক সর্বদলীয় সভা ডেকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন মিটিং-মিছিলে নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-অমান্য আন্দোলন কিছুদিন স্থগিত রাখার জন্য। যদিও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া সকলেই সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এর

দুয়ের পাতায় দেখুন

উত্তরাখণ্ডে অসুস্থ হাজার হাজার দুর্গতের পাশে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

উত্তরাখণ্ডে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত অসুস্থ ও আহতদের চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার। উত্তরাখণ্ডের জেলাগুলিতে বিপন্ন গ্রামবাসীদের চিকিৎসার জন্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সহযোগিতায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারই প্রথম এগিয়ে এসেছিল। চার সদস্যের একটি টিম প্রথমে এলাকাগুলি পরিদর্শন করে। এরপর এম এস সি-র যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্রের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের একটি পাইলট মেডিকেল টিম ২৮ জুন থেকে রুদ্রপ্রয়াগে মূল চিকিৎসা শিবিরটির কাজ শুরু করে। ৬ জুলাই আরও একটি মূল শিবির স্থাপন করা হয় বন্ডওয়ারা-ভিরি এলাকায়। এই শিবিরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ১৩ জুলাই দেরাদুনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ মিত্র জানান, এ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ ৫০ জনেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক উত্তরাখণ্ডের গ্রামে গ্রামে গিয়ে চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। মূল ক্যাম্পগুলিকে কেন্দ্র করে আশেপাশের বিধ্বস্ত এলাকায়, এমনকী দুর্গম অঞ্চলেও মোবাইল ক্যাম্পগুলি কাজ করে যাচ্ছে। তিনি জানান, এ পর্যন্ত ২৫০টিরও বেশি গ্রামে ৩৭টি ক্যাম্পে ৫ হাজারেরও বেশি মানুষের চিকিৎসা করা হয়েছে। প্রায় ৮ লক্ষ টাকার ওষুধ বিলি করা হয়েছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সামগ্রীর জন্য ব্যয় করা হয়েছে আরও ৬ লক্ষ টাকা। সমস্ত অর্থই গোটা দেশ জুড়ে স্বেচ্ছাসেবকরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। তিনি জানান, ১৬ জুলাই, বিপর্যয়ের

পাঁচের পাতায় দেখুন

উত্তরাখণ্ডে মেডিকেল ক্যাম্প

উত্তরাখণ্ডে এস ইউ সি আই (সি)-র ব্যবস্থাপনায় মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের মেডিকেল ক্যাম্প। বাঁদিকে চন্দ্রপুরী ও ডানদিকে কাকোলায়

৫ আগস্ট
সর্বহারার মহান নেতা কমরেড
শিবদাস ঘোষ
স্মরণ দিবসে
সমাবেশ
রানি রাসমণি রোড
বিকাল ৪টা
প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ
সভাপতি ঃ কমরেড সৌমেন বসু
SUCI(C)

মিছিল-মিটিং বন্ধে শাসকরা এত উৎসাহী কেন

একের পাতার পর

আগে সিপিএম শাসনে বহু ঐতিহাসিক আন্দোলন সমাবেশের ঐতিহ্যবাহী এসপ্ল্যানেড ইস্ট বা সিধু-কানহু ডহরে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই। তাঁরাও মালিকদের সুরে গলা মিলিয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মিটিং-মিছিল ছুটির দিনে করতে হবে, মিছিল চলবে রাস্তার এক ধার দিয়ে, শহরের কেন্দ্রস্থলে সভা করা যাবে না। এর গালভরা নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'রিজনেবল রেস্ট্রিকশন'। এখন সেই একই হুকুম পুলিশের মাধ্যমে কার্যকর করতে চাইছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। এর দ্বারা তিনি দেখাতে চান, এ যেন নিছকই একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। যেন এর পিছনে রাজনৈতিক পরিকল্পনা বা মতলব নেই, যা বাস্তবে সম্পূর্ণ মিথ্যা। সিদ্ধান্তটা রাজনৈতিক ভাবেই নেওয়া হয়েছে, কার্যকর করা হচ্ছে পুলিশকে দিয়ে।

স্বভাবতই মালিক শ্রেণি এবং তাদের মদতপুষ্ট সংবাদমাধ্যম মিছিল-সমাবেশ বন্ধের সরকারি প্রস্তাবে যারপরনাই উল্লসিত। এ যেন তাদেরই বহুকালের স্বপ্ন পূরণ! তাঁদেরই কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, শহরের মধ্যে রাস্তা জুড়ে আদৌ কেন এমন মিছিল-সমাবেশ করতে হবে? এমন উপদেশও দিয়েছেন যে, যাঁরা সমাবেশ করতে চান তাঁরা বাজার দর মিটিয়ে প্রেক্ষাগৃহ বা স্টেডিয়াম ভাড়া করতে পারেন। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের সৌভাগ্য যে, তাদের দেশে 'মহান গণতান্ত্রিক' ভারতের মতো সবজান্তা সংবাদমাধ্যম ও পণ্ডিত সাংবাদিকরা নেই, যাঁরা তাদের জ্ঞান দিয়ে বলতে পারেন, তোমরা রাস্তা জুড়ে মিছিল সমাবেশ কোরো না, পথ অবরোধ করে, ধর্মঘট-বনধ করে অপরের অসুবিধা কোরো না। মনে হয়, সংবাদমাধ্যমের এই উপদেশামৃত ভারতেই এত সুলভ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কিছু প্রশ্ন এসে পড়ে যেগুলি অতি সাবধানে সরকার প্রশাসন আদালত বা সবজান্তা সংবাদমাধ্যম গোপন করে যাচ্ছে। মিছিল-সভা, এমনকী ধর্মঘট করাটাও কিন্তু ভারতের সংবিধান প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে। অর্থাৎ এগুলি ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার। যে কারণে কোনও সভা-মিছিল যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে, তা নিশ্চিত করাটা পুলিশের দায়িত্বের অন্তর্গত। আদালতের সাহায্যে ধর্মঘট-বনধকে নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা কম হয়নি এ দেশে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। তাই মিডিয়া দায়িত্ব নিয়েছে, মিছিল-সভা বিরোধী জনমত তৈরিতে। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, একমাত্র ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত অংশ ছাড়া সমাজের বাকি সকল অংশের জনগণই আজ নানা দিক দিয়ে আক্রান্ত, ফলে কোনও না কোনও সময় প্রতিবাদে- প্রতিরোধে মিছিল-সভায় নামতেই হচ্ছে তাদের। মিডিয়ার প্রচারে সাময়িক বিভ্রান্তি তখন বাস্তবের কঠিন আঘাতে কেটে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই কিছু মৌলিক প্রশ্ন রাখা জরুরি। যেমন, মিছিল-সমাবেশ মানুষকে করতে হয় কেন? কেন কাজকর্ম রুজি-রোজগার বন্ধ রেখে মানুষকে ছুটে আসতে হয় শহরে মিছিল-সমাবেশ করতে? আসতে হয় প্রাণের দায়ে, বাঁচার তাগিদে। চাষিরা আসেন ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে, সার বিদ্যুৎ কৃষি-উপকরণের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি কালোবাজারির প্রতিবাদ জানাতে। শ্রমিকরা আসেন বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে, ন্যায্য মজুরি এবং মালিকদের বেআইনি ক্লোজার আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাতের প্রতিবাদ জানাতে। আদালতের কলমের এক খোঁচায় রুটি-রুজি মরতে বসেছে কয়েক লক্ষ মোটরভ্যান চালকের। তাঁরা ছুটে এসেছিলেন মহানগরীতে যদি সরকারি মন্ত্রী-কর্তাদের কানে তাঁদের বেঁচে থাকার আর্তিটুকু ঢোকানো যায়। গরিব নিম্নবিত্ত মানুষ বারে বারে ছুটে আসেন 'মূল্যবৃদ্ধি রোধ কর' দাবি নিয়ে। বেকারত্বের জ্বালায় ছটফট করতে থাকা যুব সমাজ ছুটে আসে কাজের দাবি নিয়ে। এ কথা ঠিক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জায়গা। কিন্তু সরকারি ফতোয়ায় সেই পড়াশোনার সুযোগই যদি তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়? একের পর এক সরকারি ঘোষণায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বেড়ে চলেছে লাফিয়ে লাফিয়ে, শিক্ষার বেসরকারিকরণ হচ্ছে লাগামছাড়া, সরকারি স্কুলে পাশ-ফেল নেই। ছাত্ররা যদি এর প্রতিবাদ করে তা কি অন্যায়? পরীক্ষায় অব্যবস্থা, রেজাল্ট প্রকাশে বিলম্ব,ভর্তি নিয়ে সমস্যা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন করবে না? অবশ্যই করবে এবং তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরকেই তারা বেছে নেবে। পাশাপাশি অন্যায় অসাম্য বঞ্চনার প্রতিকার জনগণ কার কাছে চাইবে? যাঁরা দেশ চালাচ্ছেন, নীতি ঠিক করছেন, নানা ফতোয়া জারি করছেন তাঁদের কাছেই তো? তা হলে রাজধানী শহর ছাড়া তার জন্য মিছিল-সমাবেশ আর কোথায় হতে পারে? না হলে, শহরে ছুটে আসার আগেই তাঁরা এ সবের প্রতিকার করেন না কেন? কেন মানুষকে দূর-দূরান্ত থেকে এ ভাবে ছুটে আসতে হয়? মন্ত্রীরা আমলারা রাইটার্স থেকে হুকুম জারি করবেন, জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নেবেন মহাকরণে বসে, আর তার বিরুদ্ধে জনগণ প্রতিবাদ করবে সুদূর কোনও গ্রামে বসে। কলকাতায় এসে গলা ফাটালেও যেখানে কদাচিৎ মন্ত্রীরা দাবি শুনতে সময় দেন, সেখানে দূরের প্রতিবাদ আমল পাবে, এ কথা চিন্তা করাই হাস্যকর।

তৃণমূল নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী হয়েই আন্দোলনের বিরুদ্ধে এত হুঙ্কার দিচ্ছেন কেন? বিশেষত নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনই যে সিপিএমকে পরাস্ত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, এ কথা কারও অজানা নয়। আজ প্রমাণ হচ্ছে, বিরোধী পক্ষে থাকার সময় আন্দোলন ছিল তাঁর কাছে সরকারি ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার, জনস্বার্থ রক্ষা তার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই সরকারি ক্ষমতায় থাকবার জন্য সিপিএম যেমন বামপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজির সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল, ঠিক একইভাবে তৃণমূল নেত্রীও ক্ষমতায় থাকার জন্য কর্পোরেট পুঁজির সেবাদাসত্ব করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হয়ত তিনি এ কথাও উপলব্ধি করতে পারছেন যে, দু'বছরের মধ্যেই তাঁর সরকার এবং দলের বিরুদ্ধে চুরি-দুর্নীতি-স্বজনপোষণ-তোলাবাজি ইত্যাদির যে-সব অভিযোগ উঠছে এবং প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে তিনি যেভাবে দলবাজি করছেন তাতে জনগণের বিক্ষোভ বেশি দিন আটকে রাখা যাবে না। তাই সরকারে বসেই একের পর এক গণআন্দোলনবিরোধী ফতোয়া জারি করে চলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, বিক্ষোভ-আন্দোলনগুলিকে যাতে তিনি অঙ্কুরেই বিনাশ করতে পারেন। কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন, এই একই চেষ্টা তাঁর পূর্বসূরিরা সকলেই করেছেন— এ রাজ্যে কংগ্রেস করেছে, সিপিএম করেছে, অন্য রাজ্যে বিজেপি এবং অন্য বুর্জোয়া দলগুলির তাঁর মতো নেতারা সকলেই করেছেন, কিন্তু কেউ সফল হননি। তিনিও ব্যর্থ হবেন। যত দিন যাবে গণআন্দোলন আরও শক্তিশালী রূপ নেবে।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মন্দিরবাজার ব্লকের গাববেড়িয়া গ্রামের পার্টি কমরেড ও এলাকার সর্বজনশ্রদ্ধেয় ফাল্গুনী চৌধুরী ১৫ মে রাতে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়া মাত্রই বিভিন্ন গ্রাম থেকে পার্টিকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত হন। পরের দিন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ও জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মাদার লস্কর সহ অন্যান্য বহু মানুষের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ১৯৬৪-'৬৫ সালে জেলার অন্যতম সংগঠক কমরেড নলিনী প্রামাণিকের যোগাযোগের ভিত্তিতে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং তৎকালীন কংগ্রেসী জোতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। গণআন্দোলনে সাহসী ভূমিকার জন্য অল্পদিনের মধ্যে তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে নির্ভরযোগ্য নেতা হিসাবে পরিচিত হন। পরবর্তী সময়ে সিপিএম-এর প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধেও তাঁকে লড়তে হয়েছে। তিনি চার বার পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন এবং সুনামের সাথে কাজ করেছেন।

১৩ জুন গাববেড়িয়া বাজার স্কুলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড ফাল্গুনী চৌধুরী লাল সেলাম

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার পাড়া ব্লকের দেউলী অঞ্চলের পার্টিকর্মী কমরেড শ্যামাপদ বাউরী গত ১৩ জুন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৭ বছর। তিনি আটের দশকের শেষের দিকে সিপিএমের প্রবল বাধা, অত্যাচার সত্ত্বেও নিজেকে এসইউসিআই(সি) দলের সাথে যুক্ত করেন। তিনি এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রার্থীও হয়েছিলেন। দল তাঁর মৃত্যুতে একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড শ্যামাপদ বাউরী লাল সেলাম।

সুপ্রিম কোর্টের রায়

একের পাতার পর

অন্যদিকে, এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, সমস্ত বৃহৎ বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া দলের নীতিহীন দুষ্ট রাজনীতির জন্যই রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন একটি মারাত্মক রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। গণতন্ত্র এবং জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের উপর এ এক মারাত্মক আঘাত। শুধুমাত্র কিছু আইনি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের দ্বারা একে দূর করা সম্ভব নয়, যদি না পাশাপাশি বুর্জোয়া দুষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলা যায়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা দরকার বলে আমরা মনে করি। ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দলগুলির হুকুমে মামলাকারী সংস্থাগুলি পরিচালিত হওয়ার ফলে অনেকসময়ই ন্যায়বিচারের মৃত্যু ঘটে। জনগণের যথার্থ গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে আন্দোলনরত প্রার্থীদের নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে হঠানোর জন্য বহু ক্ষেত্রে ভ্রান্ত এবং অন্যায্য রায় দিতে বিচারব্যবস্থায় এমন প্রভাব খাটানো হচ্ছে যে, নিম্ন আদালতের সে রায় উচ্চ আদালতে বাতিল বা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এই বাস্তব অবস্থাটি যেন, লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে অপরাধীদের প্রবেশ বন্ধ করার অথবা লোকসভা-বিধানসভা থেকে তাদের সদস্যপদ খারিজ করার উপায় খোঁজ করার উৎসাহে, দৃষ্টির বাইরে চলে না যায় বা এড়িয়ে যাওয়া না হয়।

এই পরিস্থিতিতে, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, এ ধরনের মামলায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সমগ্র বিচার প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে দিতে হবে। কোনও অবস্থাতেই ঐ বিচার প্রক্রিয়াকে বানচাল করা বা তার আবশ্যিক অংশগুলিকে পরিহার করা চলবে না। আমাদের মতে, মামলা যেখানে আপাতদৃষ্ট অপরাধের ভিত্তিতে, সেখানে আপিল করার মৌলিক অধিকার থেকে কাউকেই বঞ্চিত করা যায় না এবং সেই আপিল যেসব ক্ষেত্রে আদালত গ্রহণ করবে, সেখানে যথার্থ ন্যায়বিচারের ধর্ম অনুযায়ী যতক্ষণ আপিলের নিষ্পত্তি না হচ্ছে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া চলতে পারে না। এই ধরনের আপিল যদি বিশেষ করে বর্তমান এম পি এবং এম এল এ-দের জড়িয়ে হয়, তবে সেই মামলার নিষ্পত্তি, আমাদের মতে, যত সত্বর সম্ভব করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের দ্বিতীয় রায়টিও লক্ষণীয়। ১১ জুলাইয়ের রায়ে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি যদি কারাগারে বা পুলিশ হেফাজতে বন্দি থাকেন, তবে তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় কমিটি জোরের সাথে বলতে চায় যে, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সূচনাকাল থেকেই বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক দেশে এ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সকল অভিযুক্ত বিচারাধীন ব্যক্তি মাত্রেরই, তা তিনি জেলবন্দিই থাকুন বা জামিনে মুক্ত থাকুন, নির্বাচনে দাঁড়াবার অবাধ অধিকার রয়েছে। কারণ, আইনশাস্ত্রের মৌলিক বিধান অনুযায়ী যতক্ষণ না কারওর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তিনি নির্দোষ।

আবার, এ সত্যও মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে, আজ যখন বুর্জোয়া রাজনীতি চরম অধঃপতনের পাঁকে নিমজ্জিত, তখন গণআন্দোলন সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত সংগ্রামী মানুষদের নানা ধূর্ত উপায়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে আটকানোর জন্য শাসকদলগুলির অপচেষ্টা একটা প্রকৃত বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ জন্যই আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে মনে করে, এই সময়ে সুপ্রিম কোর্টের এই রায় নিছকই অযাচিত, একতরফা এবং ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতার উপর তথা গণতন্ত্রের উপর এক প্রত্যক্ষ আঘাত। আমরা, পরিষ্কারভাবে মনে করি, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় সম্পর্কে শান্ত ও স্থিরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত এবং এখনই এই রায়টি বাতিল করা উচিত।

নারী মর্যাদা রক্ষার যোদ্ধাদের স্মরণ করল নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি

বাপী সেন, রাজীব দাস, বরুণ বিশ্বাস, আমিনুল ইসলাম — নারীর মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ের এক এক জন নির্ভীক যোদ্ধা। নারীর অবমাননা রুখতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন এঁরা। দুর্বৃত্তরা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু মানুষের বুকের ভেতর থেকে কেড়ে নিতে পারেনি এঁদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসাকে। তাঁদের স্মরণে গত ১১ জুলাই দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদনে অনুষ্ঠিত হল শহিদ স্মরণ সভা।

সমাজ জুড়ে ঘটে চলা ক্রমবর্ধমান নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপক যুদ্ধে সামিল 'নারী নিগ্রহবিরোধী নাগরিক কমিটি' ছিল এই সভার আয়োজক। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত। উপস্থিত জনতায় উপচে পড়েছিল সভা। উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধিজীবীরা। এসেছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সম্পাদক, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার, সমাজকর্মী মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত প্রমুখ। এসেছিলেন বাপী সেনের স্ত্রী সোমা সেন, বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমীলা রায়, আমিনুল ইসলামের মা ও বাবা। এসেছিলেন সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চের বর্তমান সম্পাদক পরিমল মণ্ডল। এক সময় এই সংগঠনটির সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত বরুণ বিশ্বাস।

বক্তব্য রাখছেন সভাপতি পার্থসারথি সেনগুপ্ত। মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্টজন ও শহিদ পরিবারের সদস্যরা

প্রত্যেকের বক্তব্যেই সেদিন, শহিদদের হারানোর বেদনার পাশাপাশি ফুটে উঠেছিল যে কোনও মূল্যে এই অন্ধকার সময়কে দু'হাতে ঠেলে আলোয় উজ্জ্বল ভোর নিয়ে আসার আকুতি।

উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর কমিটির সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত বলেন, যে সমাজ-পরিবেশ ধর্ষণ, নির্যাতনের মতো ঘটনার আঁতুড়ঘর, যে সমাজ জন্ম দিয়ে চলেছে একের পর এক নরপিশাচের, তার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে 'নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি'। কমিটির উদ্যোগে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে এলাকায় এলাকায় ছোট ছোট কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলন চালানো হচ্ছে। চলছে স্কুলপড়ুয়া ছেলেমেয়েদের সচেতন করার কাজ।

বিভাস চক্রবর্তী বলেন, যে চার শহিদের স্মরণে এই সভা আয়োজিত হয়েছে, তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রমী। এঁদের মতো মানুষ সমাজে যত বাড়বে, সমাজ পাল্টানোর সম্ভাবনাও তত তৈরি হবে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সমাজে যখন এই বীভৎস তাণ্ডব চলছে, তখন প্রশাসকরা সকলেই কেন এত নিস্পৃহ? কেন তাঁরা সবসময় পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, 'এ এমন কিছু নয়'?

অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার বলেন, সমাজে আজ তৈরি হয়েছে দুষ্কৃতীরাজ। রাষ্ট্র একে মদত দেয়। এদের জন্যই মদ-জুয়া-সাট্টার আসর, নারীদেহের জোগান। এদের জন্যই বিপন্ন হচ্ছে নারীর সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা। এই রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা উচিত।

ডাঃ অশোক সামন্ত বলেন, ধর্ষিত, নির্যাতিত নারীর অসহনীয় যন্ত্রণার অনুভব নিয়ে জন্ম হয়েছে এই কমিটির। যে সমাজের বুকে ঘটে চলেছে এই ধরনের ঘটনা, তাকে পাল্টাবার ক্ষেত্রে এই কমিটির একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে।

মালবিকা চট্টোপাধ্যায় চার শহিদকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, যাঁরা চলে গেলেন, তাঁদের জন্য শোকের অন্ত নেই। কিন্তু ধর্ষিতা, নির্যাতিতা যে সব নারী প্রাণে বেঁচে রয়েছেন, সমাজে তাঁরা যাতে কোনও অমর্যাদার শিকার না হন, তা আমাদের দেখতে হবে।

নারীর সম্ভ্রম রক্ষার লড়াইয়ের চার বীর শহিদকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, এঁরাই হলেন প্রকৃত পুরুষ।

প্রতুল মুখোপাধ্যায় বলেন, নারীকে নিছক ভোগের উপকরণ ভাবার মানসিকতার মধ্যেই রয়েছে নারী নিগ্রহের মূল শিকড়। এই কালরেলায় যে পুরুষরা মূল্যবোধকে মূল্য দিয়ে প্রাণ বাজি রেখে লড়াইয়ে নেমেছেন, তাঁদের শতকোটি প্রণাম। বলতে হবে, এঁরা পারলে আমরা পারব না কেন।

সভাপতি পার্থসারথি সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করে বলেন, সমাজ জুড়ে নারীর এই যে লাঞ্ছনা, অবমাননা, 'এ আমার পাপ, এ তোমার পাপ' — এর দায় আমরা অস্বীকার করতে পারি না। নারী নির্যাতনের মানে কি শুধু ধর্ষণ, অত্যাচার? প্রতি দিন পুরুষরা পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে যে অবমাননাকর আচরণ করে চলেছেন, তা-ও তো নারী নির্যাতন। এই মানসিকতা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। তিনি বলেন, কিছু দুষ্কৃতী সমাজকে নষ্ট করতে পারে না, সমাজ নষ্ট হয় নিষ্ক্রিয়দের জন্য।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রয়াত আমিনুল ইসলামের বাবা ইজহারুল ইসলামের চোখের জলে বুক ভেসেছে। উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে তাঁর অশ্রু প্রশ্ন রেখেছে — কেন পুলিশ তার কাজ ঠিক মতো করে না, কেন পুলিশি জুলুমের কোনও প্রতিকার হয় না। বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমীলা রায়ের চোখে ছিল আগুন। তিনি বলেন, অনেক আলোচনা হয়েছে। এবার সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পথে নামার। মেয়েরা যাতে সসম্মানে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে পারে, তার জন্য জীবন বাজি রেখে আমরা লড়াই করব। সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চের সম্পাদক পরিমল মণ্ডল জানালেন, শাসক দল কীভাবে মঞ্চ ভাঙার চেষ্টা করছে, কীভাবে প্রয়াত বরুণ বিশ্বাসের সম্পর্কেও তারা কুৎসা রটাচ্ছে। মঞ্চের অঙ্গীকার, কোনও অন্যায়ের কাছে তাঁরা মাথা নোয়াবেন না এবং নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পাশে সর্বদা তাঁরা থাকবেন।

সভার শেষে বাচিক শিল্পী রূপশ্রী কাহালী ও অন্যান্য শিল্পীরা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

মোটরভ্যানের সরকারি লাইসেন্সের সিদ্ধান্ত ঘোষণা

লাগাতার আন্দোলনের জয়

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দীর্ঘ ৭ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে অবশেষে রাজ্য সরকার এই যানকে লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তকে ইউনিয়নের লাগাতার আন্দোলনের জয় হিসাবে উল্লেখ করে সংগঠনের সভাপতি সুজিত ভট্টশালী এবং সম্পাদক অশোক দাস ১১ জুলাই এক প্রচারপত্রে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের আড়াই লক্ষেরও বেশি বেকার যুবক আজ মোটরভ্যান চালিয়ে পরিবারের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামীণ জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে মাল ও যাত্রী পরিবহণে গতি আনতে উদ্ভব হয়েছে মোটরভ্যানের। স্বল্প তেলে এই গাড়ি চলে। ফলে গ্রামের কৃষক, সবজি বিক্রেতা, ক্ষুদ্র দোকানদাররা অল্প খরচে মাল পরিবহণের জন্য এই গাড়ি ব্যবহার করেন। গ্রামীণ বহু রাস্তায় মোটরভ্যানই একমাত্র ভরসা। রাতে সাপে কামড়ানো বা কলেরায় আক্রান্ত রোগী অথবা সন্তানসম্ভবা মাকে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন এই মোটরভ্যান। এমনকী পুলিশ প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনও এই মোটরভ্যানকেই তাদের কাজে ব্যবহার করেন।

মোটরভ্যান তৈরি হচ্ছে গ্রামে গ্রামে গ্রামীণ মিস্ত্রিদের দ্বারা। কোনও বড় মোটর কোম্পানি মোটরভ্যান তৈরি না করার ফলে সরকারি লাইসেন্সের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। শুধু লাইসেন্স নেই এই অজুহাতে মোটরভ্যান চালকদের উপর নেমে আসে পুলিশ ও প্রশাসনের জুলুম ও হয়রানি। ২০০৬ সালে বিগত সিপিএম সরকারের আমলে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপকভাবে শুরু হয় মোটরভ্যান আটক ও চালকদের গ্রেপ্তার। এর বিরুদ্ধে এবং মোটরভ্যান ও চালকদের সরকারি লাইসেন্স সহ ৭ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ভারতবর্ষের সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সক্রিয় উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'সারা বাংলা মোটারভ্যান চালক ইউনিয়ন'। এই সংগঠনই মোটরভ্যান চালকদের রাজ্যব্যাপী একমাত্র রেজিস্টার্ড সংগঠন।

শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালু, ট্যাক্স ফ্রি (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের) ডিজেল সরবরাহ করা সহ ৭ দফা দাবিতে ব্যাপক রাজ্যব্যাপী লাগাতার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র এই সংগঠনের নেতৃত্বে থানায় থানায়, মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন, বিক্ষোভ, অবরোধ করা হয়েছে। এই দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ, জেলা বন্ধ সহ বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। ২০১১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার জজ কোর্টে এবং কলকাতার হাইকোর্টে মোটরভ্যান চালকদের বিরুদ্ধে কেসে আইনি লড়াইও এই সংগঠন করেছে।

মোটরভ্যান চালকদের মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার, রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম পরিচালিত সরকার ও বর্তমান তৃণমূল সরকার বারবার মোটরভ্যানের লাইসেন্স দেওয়ার আশ্বাস দিলেও তা কার্যকর করেনি। মোটরভ্যানের লাইসেন্স না থাকার জন্য ২৩ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্ট সারা রাজ্যে মোটরভ্যান বন্ধের নির্দেশ দেয়। এর ফলে মোটরভ্যান চালকদের পরিবার সহ ২০ লক্ষাধিক মানুষ অনাহারের কবলে পড়বেন। বহু মোটরভ্যান চালক দেনার দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবেন।

মোটরভ্যান বন্ধ করা চলবে না, মোটরভ্যানের সরকারি লাইসেন্স দিতে হবে ইত্যাদি ৭ দফা দাবিতে রাজ্যের ১১ টি জেলা থেকে ৬০ সহস্রাধিক মোটরভ্যান চালক ৮মে, মহাকরণ অভিযানে সামিল হয়েছিলেন। প্রচণ্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দাবি আদায়ে অঙ্গীকারবদ্ধ এই সমাবেশ থেকে সংগঠনের প্রতিনিধি দল গিয়েছিল মহাকরণের পরিবহণ দপ্তরে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করতে। আন্দোলনের চাপে পরিবহণ দপ্তর বলতে বাধ্য হয়, মোটরভ্যান চলাচল বন্ধ করা হবে না এবং দ্রুত লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ধারাবাহিক আন্দোলনের পর ১০ জুলাই বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেখা গেল রাজ্য সরকার মোটরভ্যানকে লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এই সিদ্ধান্ত মোটরভ্যান চালকদের সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের জয়কে সূচিত করল। এ কথাও প্রমাণ করল যে, সঠিক নেতৃত্ব ও সঠিক পথে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলন পরিচালিত হলে জয় নিশ্চিত। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এই সিদ্ধান্তকে রাজ্য সরকার এখনও আইনসিদ্ধ করেনি। আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে মোটরভ্যানের লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্তের সরকারি ঘোষণা করতে হবে এবং দ্রুত চালকদের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সাথে সাথে মোটরভ্যান চালকদের পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালু করা, ট্যাক্স ফ্রি (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের) ডিজেল সরবরাহ সহ ৭ দফা দাবি মেনে নিতে হবে। এই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

রাজ্যের সমস্ত মোটরভ্যান চালক ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন — এই জয়ের বার্তা সকল মোটরভ্যান চালকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জেলার সর্বত্র এই জয় ও আগামী দিনের দাবি আদায়ের সংগ্রামের জন্য মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করুন। সকল মোটরভ্যান চালককে এই ইউনিয়নের সদস্য করান এবং সর্বত্র স্ট্যান্ড, ব্লক, থানা, জেলা কমিটিকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন।

গণআন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব কেন চাই

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণ দিবস ৫ আগস্ট উপলক্ষে ১৯৬৬ সালের ২৪ এপ্রিল প্রদত্ত তাঁর ভাষণের নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করা হচ্ছে। এবার শেষাংশ।

জনসাধারণ আগেও লড়াই করেছে, বর্তমানেও করছে, ভবিষ্যতেও করবে। এই লড়াই কখনও তীব্র আকার ধারণ করছে, প্রচন্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ছে, আবার কখনও ঢিমেতালে চলছে। লড়াইটা চলছেই এবং চলতেই থাকবে। কিন্তু এই সমস্ত লড়াইয়ের সামনে সব সময়ই দুটো প্রশ্ন বার বার দেখা দিচ্ছে। একটা হচ্ছে, দৈনন্দিন সমস্যা ও কতকগুলো আশু দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে যে গণআন্দোলনগুলো গড়ে উঠছে — কী সেই আদর্শবাদ যার দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারলে আন্দোলনের যে মনন তার সামনে একটা স্থির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে পারে? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আন্দোলন পরিচালনার বিভিন্ন স্তরে সংগঠনগত সমস্যার দিকগুলো। এই দুটি সমস্যা, যা আমাদের আন্দোলনগুলোর মধ্যে প্রত্যেকবারই ঘুরে ঘুরে দেখা দিচ্ছে, আমরা যার সমাধান করতে পারছি না। যদি ভবিষ্যতে এর সমাধান করতে হয় তাহলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে দিনের পর দিন ক্রমশই ঘোলাটে হয়ে উঠছে তাকে আগে পরিষ্কার করা দরকার।

আর যে মূল প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা হচ্ছে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিচেতনার উন্মেষের ও বিকাশসাধনের চেষ্টার পরিবর্তে প্রায় সবাই একজোটে 'জাতীয় স্বার্থ', 'জাতীয় পরিকল্পনা', 'জাতীয় উন্নয়ন' এইসব কথাগুলোর জাবর কেটে চলেছেন। এই কথাগুলোর সঙ্গে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে এবং রাজনৈতিক নেতাদেরও জিজ্ঞেস করতে হবে — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে যাঁরা পরিচয় দেন তাঁদের তো বটেই অন্যদেরও জিজ্ঞেস করতে হবে — আপনারা 'জাতীয় স্বার্থ', 'জাতীয় পরিকল্পনা', 'জাতীয় উন্নতি' বলতে কোন শ্রেণির 'স্বার্থ', কোন শ্রেণির পরিকল্পনা', কোন শ্রেণীর 'উন্নতি' বোঝাতে চাইছেন? যদি পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটানোই আপনাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে প্রত্যেকটি আন্দোলনের সামনে শ্রেণি আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারে আপনারা বিমুখ কেন? কিন্তু এসব কথা আমি বললে কী হবে, এরা যে সব জাতির 'হিরো', জাতীয় নেতা! কেউ ক্লাস লিডার (শোষিত শ্রেণির নেতা) হিসাবে নিজেকে উপস্থিত করে না। সাহস করে না, ভোটে জিততে হবে বলে। মধ্যবিত্তের ভোট চাই, উচ্চমধ্যবিত্তের ভোট চাই, বড়লোকদের ভোটও চাই। সমস্ত লোকের ভোট চাই। মিলেগুলে না থাকলে সমস্ত লোকের ভোট হয় না। শ্রেণিলড়াই লড়তে গেলে ভোটাভুটিতে বড় অসুবিধে। তাই জ্ঞাতসারেই হোক, আর অজ্ঞাতসারেই হোক, রাজনৈতিক নেতাদের ব্যবহার ও আচরণের পিছনে ভোটাভুটির স্বার্থটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। লড়াই আমরা সবাই চাই এবং লড়াই আমরা করছিও, কিন্তু যে কায়দায় লড়াইগুলো চালানো হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করে দেখলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠবে — আন্দোলনগুলোর পিছনে যে মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করছে তা মূলত বিক্ষোভ ধর্মী। তাই শুনতে হয়ত খারাপ লাগতে পারে, লড়াইটা মূলত বিক্ষোভমূলক আন্দোলন থেকে যাওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত এইসব আন্দোলনগুলি ভোটের বাজার গরম করার আন্দোলনের স্তরেই থেকে যাচ্ছে। তাই আমি বলি, এঁরা লড়াই-টড়াই যা বলছেন সে ভোটের বাজার গরম করার জন্য লড়াই। এ মানুষের মুক্তির উদ্দেশ্যে লড়াই নয়। লড়াই-এর আসল উদ্দেশ্য যে গণমুক্তি, তাকে ত্বরান্বিত করার লড়াই এ নয়। অথচ আমাদের তেমন লড়াই চাই, যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মানুষকে শিক্ষিত করা, ক্রমে ক্রমে মানুষগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে করতে গণমুক্তির প্রশ্নটার শেষ মোকাবিলা করা যায়। হয় জনসাধারণের মুক্তি শান্তিপূর্ণভাবে আদায় করব, পুঁজিপতিরা ছেড়ে দেবে আমরা নেব; আর যদি তারা বাধা দেয় তাহলে বিপ্লবাত্মক পথে তার মীমাংসা করতে হবে। কিন্তু মানুষের মুক্তি চাই, মানুষের মুক্তি যে করেই হোক অর্জন করতে হবে, মানুষের মুক্তি আজও হয়নি। দেশের খেটে-খাওয়া মানুষের মুক্তি হয়নি, শ্রেণিশোষণ থেকে তার মুক্তি আজও অপেক্ষা করছে।

তাহলে এইসব নেতারা যাঁরা 'জাতীয় নেতা' হিসাবে নিজেদের বলেন — তাঁরা কখনও দেশের লোকের কাছে কোনও পরিকল্পনার কথা বলার সময়ে বলেন না, পরিকল্পনাটা পুঁজিপতি শ্রেণির পরিকল্পনা। তাঁরা আলোচনা করেন — এটার এতটুকু খারাপ, অতটুকু খারাপ। আমি বলি, এটার গোটাটাই দুষ্ট। এর তো পুরো উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করা। সংকট থেকে তাকে কী করে উত্তীর্ণ করানো যায়, কোথাও যদি সে সংকটে আবদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে সে সংকট কাটিয়ে আরও কী করে তাকে দীর্ঘজীবী করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করা। তাহলে সেখানে নাট-বল্টু পাল্টাবার, এটা ওটা পরিত্যাগ করে একটু এদিক-ওদিক করার সাজেশন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তোমার কী? ওটা তো ওদের গরজ। ওটা তো ঐ শ্রেণির যারা প্রতিভূ, ঐ শ্রেণীর যারা স্বার্থ-সংরক্ষক তাদের মাথাব্যথার ব্যাপার। তোমার ব্যাপার হচ্ছে, জনতার সামনে এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যে নাটবল্টু পাল্টানোটা এই পরিকল্পনার আলোচ্য বিষয় নয়। পরিকল্পনাটা খোদ হচ্ছে গোটা দেশকে ডুবিয়ে দেওয়ার, গোটা দেশের মানুষগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়ার, পথে বসাবার ষড়যন্ত্র ও পুঁজিপতিদের স্বার্থকে সুসংহত করার ষড়যন্ত্র। আর সেই ষড়যন্ত্রটাই 'জাতীয় স্বার্থ', 'দেশপ্রেমে'র নামে চলছে। আপনারা

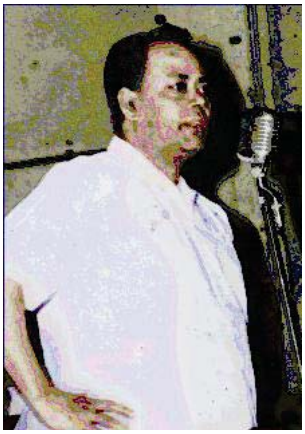

মনে রাখবেন, দেশপ্রেম, সত্যিকারের দেশপ্রেম বলতে যদি জনগণকে ভালবাসা, জনগণের স্বার্থ রক্ষা না বোঝায় তবে তা প্রকৃত দেশপ্রেম নয়। যে 'দেশপ্রেম' পুঁজিবাদের সেবা করতে শেখায় তা দেশপ্রেম নয়, তা একচেটে পুঁজিবাদের এবং মালিকপ্রথার নির্লজ্জ দাসত্ব। এবং সেই দাসত্বই এদেশে করা হচ্ছে। 'জাতীয় স্বার্থ' সংরক্ষণের বুলি কপচে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সেই দাসত্বই করা হয়ে থাকে। তাহলে এই প্রশ্নের সরাসরি মীমাংসা হওয়া দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, পুঁজিবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই পুঁজিবাদবিরোধী গণমুক্তি আন্দোলন আমাদের কর্মপন্থা, আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য — যে গণমুক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই আমাদের অর্জন করার কথা ছিল, আমরা পারিনি নেতৃত্বের অভাবে। তাই সেই নেতৃত্বের কথাটা, আন্দোলন যখন আমরা করতে যাব তখন আমাদের সামনে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

আন্দোলন এ দেশে হয়, এবারও হয়েছে। এবার যে আন্দোলন হয়েছে তা সত্যিই আমাদের দেশের গণআন্দোলনের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি। অসুস্থতার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে পারিনি, বাইরে ছিলাম চিকিৎসার জন্য। কিন্তু আমি সমস্ত ঘটনা লক্ষ করেছি। সমস্ত ঘটনার সঙ্গেই আমি পরিচিত। এজন্যই পরিচিত যে, আমার পার্টি এই আন্দোলনের একটা শরিক। আপনারা জানেন, আমাদের পার্টি এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। কাজেই সব খবরই আমি রাখি, কী ঘটেছে, আমি জানি। সে জানার মধ্য থেকে আমি একটা জিনিস পেয়েছি।

আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না। অনেকে হয়ত এর আগেও আমার আলোচনা শুনে থাকবেন, বক্তৃতা শুনে থাকবেন। আমি গতবার ২৪শে এপ্রিল ঠিক এইখানেই এইরকম একটি সভায় একটা কথা বলেছিলাম। তখন দেশের রাজনৈতিক মহলে একটা কথা খুব চালু ছিল, দেশের মানুষ নাকি লড়তে চায় না। লড়াইয়ের মন নেই, শুধু ইলেকশন-ইলেকশন মন। আমি বলেছিলাম, ভুল কথা। মানুষ আবার লড়বে। কোনদিন যে বোমার মতন ফেটে পড়বে কেউ বলতে পারে না। এ কথা বলো না যে দেশের মানুষ লড়তে চায় না। হ্যাঁ, মার খেয়েছে; বার বার নেতৃত্বকে বিশ্বাস করে লড়েছে, প্রাণ দিয়েছে। '৫৯ সালে অতবড় একটা মার খেয়ে তার ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে প্রতিক্রিয়াটা চলছে। তোমরা মনে করছ, আর মানুষ লড়তে চায় না। কিন্তু আবার মার খেতে খেতে সীমা অতিক্রম করে যাবে, তখন এই মানুষগুলো আবার বোমার মতো ফেটে পড়বে। কিন্তু তখনও একটা প্রশ্ন থাকবে, যেটা এ দেশে বারবার ঘটছে, সেই প্রশ্নটা হচ্ছে, মানুষ ফেটে পড়ল, ময়দানে এসে গেল, জান দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল; বুকের ছাতি এগিয়ে দিয়ে পুলিশকে বলছে, 'তোদের কত গুলি আছে, তোরা গুলি কর' — এইভাবে মানুষ যখন এগিয়ে আসছে তখন নেতৃত্ব বিকল, থ্রম্বসিসের রোগীর মতো বিকল। নেতৃত্ব শুধু মানুষের বিক্ষোভ দেখে। তারা জানেই না যখন মানুষ নেমে পড়ে তখন এই মানুষগুলোকে কীভাবে সংগঠিত করে তুলতে হয়, কীভাবে তাদের একটা সংগঠিত আর্মিতে পর্যবসিত করানো যায় যাতে একটা দীর্ঘস্থায়ী শৃঙ্খলাবদ্ধ লড়াই হবে, জঙ্গি লড়াই হবে, স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ হবে না। আমরা যেখানে সেখানে শক্তি ক্ষয় করতে দেব না, যা তা ভাবে কোনও কাজ হবে না। দরকার হলে পিছিয়ে আসব। কিন্তু আঘাত যখন হানব সংগঠিত আঘাত হানব যাকে মিলিটারি দিয়ে, পুলিশ দিয়ে দু'দিনেই স্তিমিত করে দেওয়া যাবে না। বিস্ফোরণমূলক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলটা কী হয়? আন্দোলনটা আপন গতিতে যতদিন পারে চলে; কিছুদিন চলতে চলতে একটা সময়ে থিতিয়ে যায় আপনা থেকে। এই থিতিয়ে আসার মুখে আমরা নেতারা বলি, 'আর তো আন্দোলনের কিছু নেই, এখন তো আর হবে না, আর তো হতে পারে না। কাজেই এখন একটা সম্মানজনক আপস করে মোটামুটি ইজ্জতটা বাঁচাও।' আর এই যে লড়াইটা হল সেটা নিয়ে খুব তালি বাজাও এবং যে মানুষগুলো লড়াই করল তাদের জোর পিঠ চাপড়াও, খুব বাহবা দাও। মার খেয়ে যা তাদের ক্ষতি হল তা তাদের। যদি জিতি তাহলে তো ভালোই। যদি না জিতি, দাবিদাওয়া না আদায় হয়, তাহলেও ক্ষতি নেই। কারণ মানুষ একটু হতাশ হলেও কংগ্রেস বিরোধী হয়ে পড়েই, সরকার ও প্রশাসনের প্রতি তাদের ভয়ানক বিক্ষোভ হয়। আর সেই বিক্ষোভটা আমরা ভোটের কাজে লাগাই। কাজেই বিক্ষোভ তোল, আর বক্তৃতা করে বল, কত লোক লড়ল, কত লোক প্রাণ দিল, কত লড়াই হল! ওটাই যথেষ্ট! আর কিছু দেখবার দরকার নেই। এইটাই তো লড়াই! এ লড়াই হবে, আর এ লড়াইয়ের মওকা আমরা ভোটে ব্যালট বাক্সে নেব। আমি বলি, এই কি নেতৃত্ব দেওয়া? এ তো বারবার ঘটছে এ দেশে। একেই আমি বলি বক্তৃতাবাজির নেতৃত্ব। জনগণকে রাজনীতিতে শিক্ষিত করা নয়, সস্তা হাততালি নেওয়া। যে সময়ে মানুষকে বোঝাতে হবে সংগঠন, মানুষকে বোঝাতে হবে আদর্শবাদ, মানুষকে বোঝাতে হবে সংগ্রামের কৌশল, মানুষকে বোঝাতে হবে তারা কী ভাবে লড়বে, এগোবে, পিছোবে — সেই সময়ে শুধু সস্তা হাততালি নিয়ে বাজার গরম করে দিয়ে আমরা চলে গেলাম। এই আমাদের নেতাদের বৈশিষ্ট্য! আমি একটু নেতাদের সম্বন্ধে বলছি এই জন্য যে, এই নেতাভিত্তিক দেশে মানুষ শুধু নেতার পিছনে পিছনে চলে। আমাদের দেশটা গুরুবাদী দেশ। সে আচার এবং আচরণ আমাদের আজও যায়নি, সে বদভ্যাস আমাদের আজও যায়নি। কাজেই এখানে নেতাদের চরিত্র, তাদের রাজনৈতিক চেতনার মান, বিপ্লবের প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা এবং তাদের ব্যক্তিগত আচরণবিধি — এই সবগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ এই সমস্ত নেতাদের আচরণ থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জনসাধারণ তাদের চরিত্র এবং রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলে। কাজেই নেতারা যদি সমস্ত প্রকার 'কেরিয়ারিজম'-এর এবং নানা ধরনের সুবিধাবাদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারেন তাহলে জনতার বিপ্লবী চরিত্র, নিয়মানুবর্তিতা এবং রাজনৈতিক চেতনা স্বচ্ছ হতে পারে না। কাজেই আন্দোলনের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনেই বহু নেতার চরিত্রে দিনের পর দিন যে সুবিধাবাদ এবং কেরিয়ারিজম-এর ঝোঁক প্রকট হয়ে চলেছে তার তীব্র সমালোচনা হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশে যে পার্টিগুলো এতদিন পর্যন্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে, সেগুলো মূলত ভোটের পার্টি। ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই হোক আর বাম-ডান কমিউনিস্ট ঝাড়াই হোক, আর যে তন্ত্র-বাদীই হোক — আসল কথা ইলেকশন পার্টি। গণআন্দোলনের সংগঠন হিসাবে আমরা ইউ এল এফ কমিটিতে আন্দোলনের প্রাক্কালে যতবার বলেছি যে, গণকমিটি, অর্থাৎ আন্দোলনে জনসাধারণের সংগ্রামের হাতিয়ারগুলো গড়ে তোল, তখন ওরা বলে ইউনাইটেড লেফট ফ্রন্টের শরিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন কর। অর্থাৎ গণকমিটির পরিবর্তে বিভিন্ন পার্টিপ্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন স্তরে ইউ এল এফ কমিটি গঠন কর। কিন্তু এই ইউ এল এফ কমিটিগুলো বাস্তবে গণকমিটির যে কাজ তার বিকল্প হতে পারে না। যে মানুষগুলো আন্দোলনে আসে, লড়াই করে, তাদের সাথে নেতৃত্বের সাংগঠনিক যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে বিভিন্ন স্তরে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনতার মধ্য থেকে বাছা বাছা লোক নিয়ে গণকমিটি গঠন করা দরকার। তা না করে শুধু বিভিন্ন পার্টি প্রতিনিধিদের নিয়ে ইউ এল এফ কমিটি গঠন করলে সেই কমিটিগুলোর কার্যত পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া এবং নির্দেশ দেওয়া ছাড়া আর কোনও ভূমিকা থাকে না। লোকে যদি লড়তে চায় তো তারা রাস্তায় এসে লড়ে যাবে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘ধর্মঘটের অধিকার ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন’

আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে কমরেড শঙ্কর সাহা

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ (আই এল ও) আয়োজিত ১০২ তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ৫-২০ জুন। সম্মেলনে ১৮৫টি দেশের শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি, সরকারি প্রতিনিধি এবং মালিকদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা। তিনি শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত নানা সেশনে বক্তব্য রাখেন। ২০ জুন মূল প্লেনারি সেশনে শ্রমিকদের ধর্মঘটের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রাখেন, যা প্রতিনিধিদের মধ্যে খুবই প্রশংসিত হয়। তাঁর বক্তব্যের মূল অংশ আমরা এখানে প্রকাশ করছি।

তিনি বলেন, গোটা বিশ্ব জুড়েই অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে শ্রমিকদের একটি মৌলিক অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ প্রসঙ্গে আমি বিশ্বায়নের উল্লেখ করব, কারণ বিশ্ব জুড়ে শ্রমিকদের অধিকার এবং জীবনযাত্রার উপর তার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। নির্মম শ্রমিক শোষণের মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করতে বিশ্বায়নের যে নীতি পুঁজিপতিরা নিয়েছে তার বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী প্রতিবাদ যাতে গড়ে উঠতে না পারে তার জন্য শ্রমনীতির মাধ্যমে মানুষের আন্দোলনের অধিকারগুলিই কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের নিরস্ত্র করা হচ্ছে। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এই পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন চালু থাকাকালীনই গোটা বিশ্ব অর্থনীতিকে অভূতপূর্ব সংকটে ডুবিয়েছে, যাতে আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলির অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিবাদের শিরোমণি আমেরিকা আজ সব চেয়ে ঋণী দেশ, যেখানে বেকারি এবং দারিদ্র বেড়েই চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং সামাজিক সুরক্ষার সরকারি ব্যবস্থায় ব্যাপক ছাঁটাইয়ের ফলে সাধারণ মার্কিন জনগণের দুর্গতি বেড়েই চলেছে। বিশ্বায়নের এই মার্কিন মডেলই অনুসরণ করে চলেছে তার অনুগামী গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলি। মহাশক্তিধর এই দেশগুলির অবস্থাও এখন হয় দেউলিয়া, না হয় দেউলিয়া হওয়ার মুখে। ইউরোপের ত্রাতা হিসাবে যে জার্মানিকে অনেকে ঘোষণা করেছিল, সেই জার্মানির অবস্থাও সংকটজর্জরিত। এশিয়ার ‘শক্তিধর’ দেশগুলিও থরথর করে কাঁপছে।

উন্নয়নশীল বলে পরিচিত দেশগুলিতে সরকারগুলি ব্যয়সংকোচের নামে শ্রমজীবী মানুষদের বহু সংগ্রামে অর্জিত অধিকারগুলি নাকচ করে দিয়ে মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনছে। বেতন কমানো হচ্ছে, পেনশন বাতিল করা হচ্ছে, ছাঁটাই করা হচ্ছে, চাকরির স্থায়িত্ব কমছে, লে-অফ করা হচ্ছে, ন্যূনতম সামাজিক পরিষেবাগুলিকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। বিপরীতে কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নানা ছাড় ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, ইনসেনটিভ, ট্যাক্স ছাড় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের মুনাফা অটুট রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। এইভাবে বিশ্বজুড়ে লগ্নি পুঁজি সাধারণ মানুষের উপর অবাধে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধুগণ, বিশ্বায়ন শুধু আর্থিক শোষণই চালাচ্ছে না, অত্যন্ত সুচতুরভাবে গোটা সমাজকে সাংস্কৃতিক এবং নৈতিকভাবে অধঃপতিত করছে, অশ্লীলতাকে উৎসাহিত করছে, ভোগবাদকে উৎসাহিত করছে, মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে এবং সামাজিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অনীহা গড়ে তুলছে। শুধু ধর্মঘট আন্দোলনের বিরুদ্ধেই নয়, শোষিত, শ্রমজীবী মানুষের যে কোনও রকম প্রতিবাদ আন্দোলনকেই গলা টিপে মারতে চাইছে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। শ্রমজীবী মানুষের একতাকে, তাদের সংগ্রামকে তারা ভয় পাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়ার দেশগুলিতে চলমান আন্দোলনগুলিতে বিশেষ করে মার্কিন শ্রমজীবী মানুষের লড়াই আন্দোলন, অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন, যেখানে স্লোগান উঠেছে, আমরা ৯৯ শতাংশ, তোমরা এক শতাংশ — এর মধ্যে শাসক শ্রেণি তাদের মৃত্যুবাণ দেখছে।

শ্রমিকরা কাজের অধিকার চাইছে, তা দেওয়া হচ্ছে না। তাদের সংগঠিত হওয়ার, কালেকটিভ বারগেনিংয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা, আশ্রয় এবং বার্ধক্যকালীন সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। শিশু ও নারী পাচার একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর শারীরিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে এবং তাদের যথেচ্ছ শ্রম দিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

শ্রমিকদের শেখানো হয়, মালিকদের মতোই তাদেরও গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু মালিকদের মারাত্মক আক্রমণ ও অত্যাচারের মুখে পড়ে শ্রমিকরা যখন সামাজিক স্বার্থ, গণতন্ত্র ও সভ্যতাকে বাঁচানোর স্বার্থে আন্দোলনে নামে, তখন শোষণমূলক এই সমাজব্যবস্থার রক্ষক সরকার শ্রমিকদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনে। এইভাবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বরূপটি ফাঁস হয়ে যায়। বাস্তবে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অবাধ স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র রয়েছে। তাই ধর্মঘটের অধিকার ছাড়া শ্রমিকদের কাছে গণতন্ত্রের কোনও মানে নেই। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনে যে অজস্র অধিকারের কথা বলা হয়েছে, তা সবই অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের দাসযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যখন কাজে ধর্মঘট করা ছিল অপরাধ।

তাই বন্ধুগণ, বর্তমান সভ্যতা দাবি করছে, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ এবং বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করা, যাতে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং ধর্মঘটের অধিকার যা আজকের যুগে শ্রমজীবী মানুষের মূল মানবিক অধিকার — সেগুলিকে রক্ষা করা যায়।

উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয় প্রসঙ্গে রাঁচিতে আলোচনাসভা

‘উত্তরাখণ্ডে এই বিপর্যয় কেন’— এই বিষয়ে ৫ জুলাই ঝাড়খণ্ডের রাঁচির সত্যভারতী হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আয়োজন করেছিল এস ইউ সি আই (সি), সিপিআই(এমএল), সমাজবাদী জনপরিষদ এবং জনমুক্তি সংঘর্ষ বাহিনী। এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতি সহ অন্যান্য বক্তারা বলেন, উত্তরাখণ্ডের এই দুর্ঘটনা শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, এত ক্ষয়ক্ষতির প্রধান কারণ দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফা লালসা। তাঁরা বলেন, উন্নয়নের নামে যেখানে সেখানে ডিনামাইটের বিস্ফোরণ, সুড়ঙ্গ তৈরি, ব্যাপক গাছ কাটা, নদী ও ঝরনার গতিপথ পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতির কারণেই এত বিরাট সংখ্যায় প্রাণ এবং সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের আগাম সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি, বিপর্যয়ের পরেও ত্রাণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। তাঁরা বলেন, অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ না নিলে আগামী দিনে এর চেয়ে বহুগুণ ভয়াবহ দুর্যোগ নেমে আসবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সোচ্চার ধিক্কারে ‘অভিনন্দন’ জানাল আফ্রিকার জনতা

গত জুন মাসের শেষের দিকে আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আফ্রিকার উপর মার্কিন প্রশাসন ও অর্থনীতির সদর দপ্তর যথাক্রমে ওয়াশিংটন ও ওয়াল স্ট্রিটের শোষণ এবং সামরিক আধিপত্য বৃদ্ধিই ছিল তাঁর সফরের প্রধান উদ্দেশ্য।

সেনেগালে গিয়ে ওবামা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা গোরি দ্বীপের ‘স্লেভ ক্যাসল’ মিউজিয়ামটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানকার একটি সংবাদপত্র লিখেছে, ওবামা আসায় সেনেগালবাসী

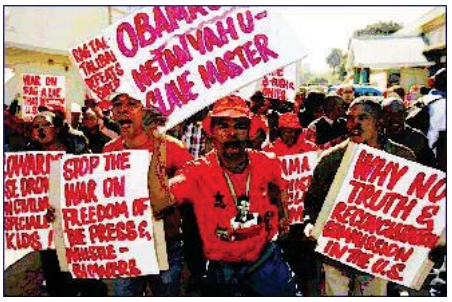

পেল শুধু প্রবল যানজট, বন্ধ করে দেওয়া রাস্তা এবং নিরাপত্তাব্যবস্থার ছড়াছড়ি, অন্য কিছু নয়। অন্য একটি সংবাদপত্র ‘লে পপুলেয়ার’ লিখেছে, মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনী এমনকী টেলিযোগাযোগ ও সেনেগালের প্রেসিডেন্ট ভবনকে পর্যন্ত কব্জায় নিয়ে নিয়েছিল।

তবে সবচেয়ে সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাধারণ মানুষ, যাঁরা প্রায় দু’দশক আগে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন চালিয়ে তাদের ক্ষমতা থেকে হঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল যে ‘কংগ্রেস অব সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়ন্স’ এবং ‘সাউথ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টি’র যুব শাখা ‘ইয়ং কমিউনিস্ট লিগ’, তারা ওবামার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখিয়েছে। প্রিটোরিয়ায় মার্কিন দূতাবাসের সামনে ২৮ জুন শত শত বিক্ষোভকারী জমায়েত হয়েছিলেন। আমেরিকার পতাকায় আগুন ধরিয়ে তাঁরা স্লোগান দেন, ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া থেকে হাত ওঠাও’। ব্যানার-প্ল্যাকার্ডে সজ্জিত সমাবেশ থেকে মার্কিন রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির জোরালো দাবি ওঠে। দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্ট অবস্থিত যে শহরে, সেই কেপ টাউনেও ওবামার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন মানুষ। তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন জোহানেসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, যেখান থেকে ওবামাকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন সাম্মানিক উপাধিটি ফিরিয়ে নেওয়া হোক, কারণ ওবামা এর যোগ্য নন। উত্তাল বিক্ষোভকে বাগে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলিম ধর্মাবলম্বী আইনজীবীদের সংগঠন ওবামাকে গ্রেপ্তার করার অনুরোধ করে আদালতে আবেদন জানিয়েছেন। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি চালিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যার দায়ে ওবামাকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা, যিনি বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে ২৭ বছরেরও বেশি সময় কারাগারে ছিলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ওবামা। যদিও একবারের জন্যও তিনি স্বীকার করেননি, সে দেশে বর্ণবৈষম্য টিকিয়ে রাখার পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য ভূমিকার কথা। বস্তুত ম্যান্ডেলার দীর্ঘ কারাদণ্ডের পিছনেও মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর সিআইএ-রই প্রত্যক্ষ হাত ছিল।

পিতার জন্মভূমি হওয়া সত্ত্বেও ওবামা কেনিয়ায় যাননি। কারণ, সেখানকার প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস ও মার্কিন বিদেশ দপ্তরের না-পসন্দ। ওবামা জিম্বাবোয়েতেও যাননি। কারণ, ব্রিটেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সরকারও নির্মম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেখানকার প্রেসিডেন্ট রবার্ট মুগাবের সরকারের উপর। সুদান সফরও স্থগিত রেখেছেন তিনি, যে সুদানের তেলসমৃদ্ধ দক্ষিণাঞ্চল কে দেশের অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

অন্যান্য দেশ সফরের সময় যেমন হয়, ঠিক তেমন ভাবেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের আফ্রিকা সফরের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন, মার্কিন শেয়ার বাজার ওয়াল স্ট্রিট ও সামরিক সংস্থা পেন্টাগনের স্বার্থসিদ্ধি করা। ওবামা আফ্রিকার জন্য ৭০০ কোটি ডলার ‘সাহায্যে’র কথা ঘোষণা করেছেন এই সফরে এসে। কিন্তু এর থেকে বহু গুণ বেশি টাকা যে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলি অচিরেই শুষে নেবে আফ্রিকার প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ লুঠ করে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

রাঁচিতে কমরেড প্রতিভা মুখার্জী স্মরণসভা

এআইএমএসএস এবং এআইডিএসও রাঁচি জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৩ জুলাই রাঁচির এসইউসিআই(সি) কার্যালয়ে এআইএমএসএস-এর পূর্বতন সর্বভারতীয় সভানেত্রী ও দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড প্রতিভা মুখার্জীর স্মরণে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রয়াত নেত্রীর জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড রবীন সমাজপতি। সভায় কমরেডস সিদ্ধেশ্বর সিং, কেয়া দে, স্বরূপ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার

এক্কের পাতার পর

এক মাস পূর্তির দিন এস ইউ সি আই (সি) এবং এম এস সি-র উদ্যোগে এলাকার নাগরিকরা রুদ্রপ্রয়াগ বাজারে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

সম্মেলনে ডাঃ মিত্র গোটা দেশের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ঝাছে দুর্গত মানুষের সেবায় এগিয়ে আসার আবেদন জানান। সাথে সাথে সকলের কাছে উদার অর্থসাহায্যের আবেদনও জানিয়েছেন তিনি। এ সি পেয়ি চেক বা ড্রাফট পাঠাতে হবে **‘MEDICAL SERVICE CENTRE, payable at KOLKATA’** এই ঠিকানায়।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

চারের পাতার পর

আমরা নেতারা দরকার হলে খবর পেয়ে গাড়ি করে গিয়ে সেখানে একটা বক্তৃতা দিয়ে চলে যাব। আমরা জানি না কারা রাস্তায় আসছে, কারা লড়াই করছে, কোথা থেকে তারা আসছে, আবার কোথায় চলে যাচ্ছে। আমাদের অত খোঁজ রাখবার দরকার নেই। তারা রাস্তার লোক, রাস্তায় জড়ো হয়, রাস্তায় মিশে যায়। তাতেই আমাদের কাজ চলে। কেন কাজ চলে? না, তার কারণ হচ্ছে, এই পুরো কর্মকাণ্ডে যে ক্ষয়ক্ষতিটা তাদের হয় তাতে তাদের কংগ্রেসের প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধা হয়, ভয়ানক ঘৃণা হয়। মার খেলে নেতৃত্বেরও যে তারা সমালোচনা করে না তা নয়। কিন্তু নেতারা সব এইরকমভাবে ভাবে যে, আমাদের সমালোচনা করুক আর যাই করুক, এই মানুষগুলো মূলত কংগ্রেসবিরোধী তো! ইলেকশন-এ আমি দাঁড়ালে আমি ছাড়া কাকে ভোট দেবে! না হয় একটু সমালোচনা করলই। এইরকমভাবে যারা ভাবে তারা সব বাস্তুঘুঘু! এই বাস্তুঘুঘুরাই আজকাল দেশের রাজনৈতিক আসর জাঁকিয়ে আছে, নেতৃত্বের অনেকখানি দখল করে আছে।

তাই আমি বলি যে, লড়াইয়ের সামনে আদর্শবাদ চাই এবং একটা সুষ্ঠু সংগঠনগত পরিকল্পনা চাই। একটা লড়াই এমনি হয় না। সংগঠন একটা এমনি হয় না। তার সামনে একটা আদর্শও তুলে ধরতে হবে। কী সেই আদর্শ বামপন্থীরা তুলে ধরেছে, রোজের এই খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা চাই — এই সব কথা ছাড়া? কংগ্রেস একটা আদর্শ দেশের লোকের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করছে। সেটা হচ্ছে উগ্র জাতীয়তাবাদ। এটাকে তারা দেশাত্মবোধ বলে চালাচ্ছে। বামপন্থীরা কেউ কেউ জনগণতন্ত্র, আবার কেউ কেউ একটা ভাসা ভাসা সমাজতন্ত্র চাই, সমাজতন্ত্র চাই করছে। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রটা কী? উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার পার্থক্য এবং লড়াই কোথায়? দেশাত্মবোধের সঙ্গে তার মিল কোথায়? জাতীয়তাবাদের সাথে তার কোথায় মিল, কোথায় দ্বন্দ্ব? এসব কোনও কিছুই দেশের মানুষের সামনে পরিষ্কার করা এইসব বামপন্থীরা তাদের গুরুদায়িত্ব বলে মনে করে না। আর এই জিনিসগুলো পরিষ্কার না হলে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয় না, স্বচ্ছতা আসে না জনসাধারণের মনে। সে লড়াইটা হয় অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া। শুধু একটা বিক্ষোভ, একটা ঘৃণা মনের মধ্যে যেটা রয়েছে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চোখের সামনে যাকে দেখতে পাই প্রশাসনের প্রতিভূ হিসাবে তারই বিরুদ্ধে আমরা বোমার মতো ফেটে পড়ি। ফেটে পড়তে বাধ্য। আর জনসাধারণ চিরদিন মার খেয়েছে। সে আপন নিয়মে লড়াই করে। মারের প্রত্যুত্তর সে দেয়, নেতা তাকে পথ দেখাক বা না দেখাক। তাই আমি বলতে চাই, আন্দোলনের সামনে আমাদের একটা সুস্পষ্ট আদর্শ চাই-ই। এই আদর্শ আমাদের কী? আমাদের এ আদর্শ সমাজতন্ত্র এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ। মনে রাখবেন, সমাজতন্ত্র, প্রকৃত সমাজতন্ত্র, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন সমাজতন্ত্র হচ্ছে নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ, সম্ভবত উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেও তা নিকৃষ্ট। কিন্তু সে সমাজতন্ত্রও আমাদের দেশের বামপন্থীদের মধ্যে আছে। এ রকম সমাজতন্ত্রী আমাদের বামপন্থীদের মধ্যে আছে যাদের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি কোনও দায়িত্ব নেই। তারা এ ব্যাপারে কোনও দায়িত্ব অনুভব করে না। বরং তারা যে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতার দ্বারাই পরিচালিত তা নিয়ে তাদের গর্ববোধ আছে। তারপরেও তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলে! কিন্তু তার বিপদ কোথায়? হয়ত তারাও তা জানে না এবং জনসাধারণকেও আমরা এই ব্যাপারে একেবারেই অন্ধকারে রেখেছি বলা চলে। কিন্তু আমি বলি, দেশের মানুষকে এই কথাগুলো বুঝতেই হবে। যারা সমাজতন্ত্রের কথা বলবে তাদের অবশ্যই সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী হতে হবে, কারণ সমাজতন্ত্র সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। এছাড়া অন্য যে সমাজতন্ত্র তা ঐ নানাপ্রকার — হয় নেহেরুর সমাজতন্ত্র, না হয় মোরারজির সমাজতন্ত্র, না হয় বার্ট্রান্ড রাসেলের সমাজতন্ত্র, না হয় ইজিপ্টের নাসেরের সমাজতন্ত্র, আর না হয় এইরকমই নানা লোকের নানা সমাজতন্ত্র। কিন্তু তার দ্বারা কোথাও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। হয়ওনি দুনিয়ায়। হয়েছে পুঁজিবাদ, না হয় হিটলার মুসোলিনীর সমাজবাদ, যা এনেছে ফ্যাসিবাদ। তারাও সমাজতন্ত্রের বুলি জোর আওড়েছে। কিন্তু তার দ্বারা মানুষকে ঠকিয়ে তারা এনেছে ফ্যাসিবাদ, সামরিকবাদ, উগ্রজাতীয়তাবাদ, জাতিদম্ভ — সমাজতন্ত্র আনতে পারেনি, আনতে চায়ওনি। তাই সমাজতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের এই ওতপ্রোত সম্পর্ককে আপনাদের মনে রাখতে হবে। যেখানেই সমাজবাদ সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের কোনও অবলিগেশন (দায়দায়িত্ব) মানে না সেখানেই সমাজবাদের জোচ্চুরি ধরতে হবে। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই এবং কোনওরূপ আপস করাও চলতে পারে না। এ জোচ্চুরি আপনাদের ধরে ফেলতে হবেই। ধরতে পারলে তবেই আপনারা ছেঁকে নিতে পারবেন যে, তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মধ্যে প্রথমেই কারা কারা বাদ হয়ে গেল। তারপরেও মনে রাখতে হবে, কোনও পার্টি সমাজতন্ত্র ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা মুখে স্বীকার করলেই সব শেষ হয়ে গেল না। তারপরে দেখতে হবে, এই সমাজবাদী আদর্শের প্রয়োগ এবং ভারতীয় বাস্তব অবস্থা, ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার সুষ্ঠু এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তারা করতে পেরেছে কি না। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ, ভারতবর্ষের নৈতিক অধঃপতন, ভারতীয় সমাজের রোগকে তারা ধরতে পেরেছে কি না। সে রোগ কী? নৈতিক অবনতির ক্ষেত্রে রোগ হল আদর্শের ক্ষেত্রে সংকট। আমরা একটা সময়ে দেখেছি, ক্ষুদিরামের যুগে, এ দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের 'ফ্লাওয়ার্স অব বেঙ্গল' বলা হত। ঘর ঘর থেকে 'কেরিয়ার' ছেড়ে দিয়ে স্কুল-কলেজের ছেলেরা সব রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার জন্য। ফাঁসিকাঠকে ভয় করেনি, জেলকে ভয় করেনি, অত্যাচারকে ভয় করেনি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কাব্য, সাহিত্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি মানুষের নতুন নতুন অভিযান। কিন্তু আজ দেখছি কাব্য সাহিত্য সংস্কৃতিপ্রতিটি ক্ষেত্রে চলছে মালিক শ্রেণি, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রেণির তোষণবাদ। তোষণবাদের মধ্য দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট প্রগতির চর্চা! এমন প্রগতি করতে হবে, যে প্রগতিতে গলাটি বাঁধা পড়বে না। প্রগতিও হবে কিন্তু গলা বাঁধা পড়বার সম্ভাবনা নেই, জেলে যাওয়ার ভয় নেই এবং মালিক শ্রেণির ডান্ডার ভয় নেই। তেমন নির্ঝঞ্ঝাট প্রগতির চর্চা করতে হবে। রেখে-ঢেকে করতে হবে। সংকটটা হচ্ছে এই আদর্শের সংকট, সাংস্কৃতিক সংকট। আর এই সংকটের বুনিয়াদই হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট যা আমি পূর্বেই আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি। ঐ আমেরিকায়ও তাই। টিনএজারদের সমস্যা নিয়ে তারা যে চিৎকার করছে, এটা একটা সমস্যা। এ সমস্যার মূল কারণ তাদের সমাজের বুনিয়াদ-এর মধ্যে। অর্থাৎ আমেরিকান সমাজ আদর্শের সংকটে আজ হাবুডুবু খাচ্ছে। তার আদর্শবাদ সে হারিয়ে ফেলেছে। যে জেফার্সন, লিংকনের জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, গণতন্ত্রের আদর্শ একদিন আমেরিকান জাতিকে স্বাধীনতাকামী জাতি হিসাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং বিশ্বকে আকর্ষণ করেছিল, সেই স্বাধীনতার ধারণা আজ একটি প্রিভিলেজ-এ পরিণত হয়েছে, আজ এই ব্যক্তিস্বাধীনতা আমেরিকান সমাজে একটা সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। কাজেই যখন কোনও একটা আদর্শ সময়ের গতিপথে সুবিধাবাদে পর্যবসিত হয়ে যায় তখন সে তার বিপ্লবাত্মক এবং প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে ফেলে। আপনাদের মনে রাখা দরকার, সমাজের অভ্যন্তরে পরস্পরবিরোধী মূল শক্তিগুলোর সংঘাতের ভিতর দিয়ে ইতিহাসে একটা আদর্শ আসে পুরনো আদর্শকে ভেঙে ফেলে দিয়ে একটা নতুন সমাজব্যবস্থা গড়বার জন্য। কিন্তু সেই আদর্শটাও আবার চলতে চলতে একদিন কায়েমি স্বার্থবাদের আদর্শে রূপান্তরিত হয়। তখন সে হয়ে যায় কায়েমি স্বার্থবাদীদের সুবিধা, প্রিভিলেজ। যখন তা প্রিভিলেজ হয়ে যায় তখন সে আর কোনও জাতিকে বা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তখন সে শুধু কেনা দাস, কতকগুলো চাকরের সৃষ্টি করে, মাইনে করা চাকরের সৃষ্টি করে। কাজেই আজ কাব্য জগতের ক্ষেত্রে, শিক্ষা জগতের ক্ষেত্রে, নাট্য জগতের ক্ষেত্রে, ছাত্রদের মধ্যে সমস্ত জায়গায় শৃঙ্খলার মানে দাঁড়িয়েছে অফিসের আইন-কানুন মেনে চলা আর লেফট-রাইট করা। শিক্ষা মানে হচ্ছে গভর্নমেন্টের ভালো চাকরি পাওয়া, শিক্ষা মানে হচ্ছে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কারিগরি শিক্ষা এমন অর্জন করা যাতে আমি বড় মিস্ত্রি হতে পারি, বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে পারি। আমার মানবিক মূল্যবোধ কত, ইতিহাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কত এবং ইতিহাসের তাৎপর্য আমি কত বুঝি, সমাজের মূল্যবোধ আমার মধ্যে কতখানি আছে, মানুষ হিসাবে আমি কী ধরনের — অত কথা দেখার দরকার নেই। কারণ আমি মস্ত বড় শিক্ষিত লোক, আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি নাটবল্টু ঘোরাতে পারি, আমি চার হাজার টাকা রোজগার করি। এই হল সমাজের মনন। এই মননে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে।

তাই আমি বলছিলাম, যে স্বাধীনতা আন্দোলনের, যে দেশাত্মবোধের, দেশপ্রেমের কথা বললে একদিন এ দেশের ছেলেদের জেলে যেতে হত, গলা ফাঁসিকাঠে ঝুলত, সেদিনের দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ ছিল প্রগতিশীল বিপ্লবাত্মক আদর্শ। তাই সেই আদর্শে একদিন জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আজ সেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে একটা সুবিধায়, সুবিধাবাদী অস্ত্রে পর্যবসিত হয়েছে। আজ যারা জাতীয়তাবাদের কথা বলে তারা আসলে সুবিধাবাদের জাবর কাটছে; দেশের মানুষের জাতীয়তাবাদ কথাটার অর্থ, দেশসেবা করার অর্থ দাঁড়িয়েছে চাকরি করা, গোলামি করা, প্রভুদের খুশি করা। এখানে ভলান্টারি সার্ভিস বলে কিছু নেই। অথচ ডিসিপ্লিন কথাটার কোনও মানে নেই যদি তা ভলান্টারি না হয়। 'তুমি আমার মাইনে করা চাকর, আমি তোমাকে মাইনে দিচ্ছি কাজেই তুমি অফিসের নিয়মকানুন মানবে, না মানলে তোমার চাকরি চলে যাবে।' এই চাকরির ভয়ে তুমি ডিসিপ্লিন মেনে চলছ। এর নাম কি ডিসিপ্লিন? একে ডিসিপ্লিন বলে না। ডিসিপ্লিন কথাটার একটাই মানে, তা সেল্ফ-ইমপোজড (স্বেচ্ছা-আরোপিত)। এই 'ভলান্টারি ডিসিপ্লিন' জাতির চরিত্রের মধ্যে আজ আর নেই বললেই চলে। আসবে কোথা থেকে? কারণ যে আদর্শবাদ একদিন জাতিকে ডিসিপ্লিন শিখিয়েছিল সে আদর্শবাদ আজকে মালিক শ্রেণি ও শাসক শ্রেণির হাতে সুবিধাবাদে পর্যবসিত হয়েছে।

আমাদের নতুন আদর্শ চাই। সমাজ একটা নতুন আদর্শের জন্ম দেওয়ার যন্ত্রণায় কাঁপছে। কী সেই আদর্শ, যে এই জগদ্দল পাথরের শৃঙ্খলকে ভাঙতে পারে? তা হল সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ, সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ, সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শ, পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের আদর্শ। এই আদর্শে যদি দেশের মানুষকে আমরা উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করতে পারি, সংগ্রামকে গড়ে তুলতে পারি তাহলে দেখব আবার দেশের মধ্যে সেই নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আবার মানুষের মধ্যে সেই ক্ষুদিরামের তেজ, আবার ছাত্রদের মধ্যে সেই তেজ ফিরে এসেছে, তার আগে নয়। এ কথাটাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

সর্বশেষে, আমি একটা কথাই বলব, যে কোনও লড়াইতেই হাততালি দেবেন না। লড়াইটা যখন বাধে সবাইকে মিলেই তখন লড়াই করতে হয়। ভুল হোক, শুদ্ধ হোক মানুষকে লড়াই করতে হবে। সবাইকে অবশ্যই লড়াইতে থাকতে হবে। কিন্তু চোখ কান খুলে রাখবেন। বোঝবার চেষ্টা করবেন, এ লড়াইয়ে ফয়দা কার হচ্ছে। কারণ লড়ছি আমরা-আপনারা, সাধারণ মানুষ। ফয়দা ওঠাচ্ছে কতকগুলি রাজনৈতিক টাউট যারা ভোটের মধ্য দিয়ে নিজেদের কেরিয়ার গোছাতে চায়। কাজেই আমরা এই লড়াইগুলিকে যদি মুক্তি সংগ্রামের একটা পরিপূরক সংগ্রাম বলে মনে করি, জনসাধারণের শক্তিশালী মুক্তি লড়াইয়ের পাদপীঠ বলে মনে করি, ধীরে ধীরে এগুলির মধ্য দিয়ে সে মুক্তির লড়াই গড়ে উঠবে বলে মনে করি, তাহলে আমাদের এই লড়াইগুলোর সংগঠনের দিক, এই লড়াইগুলোর আদর্শবাদের দিক ধীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

'হুল' বার্ষিকী উদযাপন

সাঁওতাল বিদ্রোহ 'হুল' স্মরণে ৩০ জুন সিদো-কানহু মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে কলকাতার সিদো-কানহু-ডহরে স্মৃতিফলকের সামনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্মৃতিফলকে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট সাঁওতালি সাহিত্যিক সারদা প্রসাদ কিস্কু, কমিটির সদস্য পরিমল হাঁসদা, জগদীশ সিং, অপর্ণা মণ্ডল, সরস্বতী টুডু, বিমল মান্ডি, বিশিষ্ট সমাজসেবী নেপাল সিং প্রমুখ। প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বহু মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ 'হুল' দিবস উপলক্ষে ৭ জুলাই কলকাতার ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাগৃহে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমিটির কার্যকরী সভাপতি পূর্ণচন্দ্র সরেন। বিশিষ্ট সাঁওতালি সাহিত্যিক পরিমল হেমব্রম, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ আনন্দ রঞ্জন বেসরা উপস্থিত ছিলেন। পরিমল হেমব্রম বলেন, ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন হাজার হাজার সাঁওতাল ভগ্নাডিহির মাঠে সমবেত হয়ে জমিদার, মহাজন, ঠিকাদার ও পুলিশ-প্রশাসনের শোষণ, জুলুম, অত্যাচারের প্রতিকার চেয়েছিলেন। তাঁরা শান্তিপূর্ণ ভাবেই কলকাতায় বড়লাটের কাছে দাবি জানাতে পদযাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু ৭ জুলাই প্রশাসনের উদ্ধত আচরণে বিদ্রোহীদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সিদো-কানহুর নেতৃত্বে তাঁরা 'হুল' ঘোষণা করেন। কমিটির কার্যকরী সম্পাদক বিসম্বর মুড়া সাঁওতাল বিদ্রোহের এই গণসংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ-জুলুম-অত্যাচারের প্রতিবাদে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শোষিত মানুষের সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। এই সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সাঁওতালি সঙ্গীত শিল্পী শিখা মাণ্ডি ও সম্প্রদায়।

দঃ২৪ পরগণা ঃ ৩০ জুন দঃ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি থানার শ্যামনগরে 'হুল' বার্ষিকী উদযাপিত হয়।

এসইউসিআই(সি)-র প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য ভরত সরদার এবং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিসম্বর মুড়া আলোচনা করেন। সভা পরিচালনা করেন প্রভাস সরদার।

‘নির্বিঘ্নে’ বা ‘শান্তিতে’ নয়, এবারও ‘হুকুমে’র ভোট

বহুচর্চিত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ভোট প্রক্রিয়ায় কার্যত পর্বতের মুষিক প্রসব ঘটল। প্রথম দফায় ১১ জুলাই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চিত্র তাই প্রমাণ করেছে। দীর্ঘকাল জুড়ে সিপিএমের আমলে এ জেলার মানুষ স্বাভাবিক ভোট কাকে বলে তা জানতেন না। মস্তান গুণ্ডাদের পছন্দমতো কোথাও ভোট হয়েছে, কোথাও তাদের দরকার মতো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেছে। ২০১১ সালে রাজ্যে প্রবল প্রতিবাদী জোয়ারের বিধানসভা ভোটেও এ জেলার গড়বেতার সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষ ৪০টি বুথ দখল করে সিট জিতে নিয়েছিলেন। রাজ্যে পালাবদল হলেও সন্ত্রাসের ভোট যথা পূর্বং তথা পরং।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপুল সিট জিতে নিয়ে বাকিটা দখল নিতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরিয়া চেষ্টা ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। ৮ জুলাই মেদিনীপুর সদর ব্লকের বনপুরা অঞ্চলের মিচকা ও পাচরা বুথে কেশপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আনা ভাড়াটে গুণ্ডাদের আক্রমণে এস ইউ সি আই (সি)-র শতাধিক কর্মী-সমর্থক রক্তাক্ত হন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হয় কেশপুর গড়বেতা বানিয়ে দেব’। পাড়ার পর পাড়ায় সশস্ত্র বাইক বাহিনীর তাণ্ডব চলে। ঘর থেকে মহিলাদের টেনে বাইরে বের করে এনে ব্যাপক মারধর করা হয়। যৌন নিগ্রহও বাদ যায়নি।

গুরুতর আহত হয়ে মেদিনীপুর হাসপাতালে ৯ জন ভর্তি হয়েছেন। এদের মধ্যে বাসন্তী মাণ্ডি, সোমবারী মাণ্ডির যৌনাঙ্গে গুরুতর আঘাত করা হয়েছে। পাঁজর ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৭০ বছরের বৃদ্ধা সুন্দরী সরেনের। চিন্তামণি সরেনের উপর এমন আঘাত করা হয়েছে যে তিনি সার্জিকাল বিভাগে ভর্তি। ৭১ বছরের বৃদ্ধা জশী মুর্মুর হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। হাত ভেঙেছে কল্পনা মাণ্ডিরও। পিঠের হাড় ভেঙেদিয়েছে উমা মুর্মুর। জগন্নাথ মুর্মুরও হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। পরান সরেনের পিঠে ও পায়ে গুরুতর আঘাত। আরও অনেককে হাসপাতালে আনতে বাধা দেয় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। দলের পক্ষ থেকে থানা, বিডিও, এসডিও, নির্বাচন কমিশনের অবজারভার সহ প্রশাসনের স্তরে স্তরে জানালেও পুলিশ আসে দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার পর। দুষ্কৃতীরা যে পাড়ায় সন্ত্রাস করছে পুলিশ সেখানে না গিয়ে গেছে সেই পাড়ায় যেখানে দুষ্কৃতীরা আগেই তান্ডব চালিয়ে গেছে। গোটা এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করে শেষে পুলিশ ও সশস্ত্র তৃণমূল বাহিনী প্রকাশ্যেই মিলিত হয়। এসইউসিআই(সি)-র পঞ্চায়েত সদস্য বঙ্কিম মুর্মুর বৃদ্ধা মা গুরুতর আহত হয়ে কাতরাতে থাকলেও পুলিশের সামনেই দুষ্কৃতীরা হুমকি দেয়, হাসপাতালে নেওয়া যাবে না। তারা আরও হুমকি দেয়, এখানে এসইউসিআই(সি) থাকবে না এবং বিকালে তৃণমূলের মিছিলে সকলকে থাকতে হবে, নতুবা আরও ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে। গড়বেতা, সবং, নারায়ণগড়, দাঁতন, সাঁকরাইল, ঝাড়গ্রাম ধেড়ুয়া, ডেবরা প্রভৃতি এলাকা সহ সর্বত্র আক্রান্ত হয়েছে এসইউসিআই(সি)-র প্রচার মিছিল। নির্বাচন কমিশনের অনেক ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও ভোটের আগের দিন পর্যন্ত সদরের মিচকা বুথে, দাঁতনের পলাশীতে এসইউসিআই(সি)-কে আক্রমণ করতে নেমেছে বাইক মিছিল। এসইউসিআই(সি)-কে ভোট দিতে গেলে পরিণাম খারাপ হবে এমন হুমকি দিয়ে হার্মাদ বাহিনী দাপিয়ে বেড়িয়েছে। পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। প্রকাশ্যে কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা মদ-মাংসের হুল্লোড় এবং ভীতি সন্ত্রাস পুলিশ-প্রশাসন এবং অবজার্ভাররা দেখেও দেখেননি। তথাকথিত ‘অবাধ’ ও ‘শান্তিপূর্ণ’ ভোট আগে যেমন সিপিএম করেছে এবার তেমনই করল তৃণমূল। সবং ব্লকের মোগলানীচক বুথ এবং চন্দ্রকোণা ব্লকের বড় বালা বুথে প্রকাশ্যে ছাপ্পা ভোট চলেছে। এসইউসিআই(সি) দলের সংশ্লিষ্ট বুথগুলির প্রার্থী এবং এজেন্টদের পক্ষ থেকে প্রিসাইডিং অফিসার, সেক্টর অফিসার এবং অবজার্ভারদের বলেও এবং দলের জেলা সম্পাদকের পক্ষ থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে জানিয়েও তা বন্ধ করা যায়নি। ফলে এবারও পূর্বের মতোই হল ‘হুকুমে’র ভোট।

আহত এস ইউ সি আই (সি) কর্মী-সমর্থকরা

নির্বাচন কমিশন তথাকথিত সুষ্ঠু ভোটের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই বলে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনী পেলেও তাঁদের সকলকে মাওবাদী মোকাবিলার অজুহাতে জঙ্গলমহলে পাঠিয়ে দিল। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীবিহীন কেবল জেলা পরিষদের প্রার্থীযুক্ত উত্তেজনাহীন বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হল। অথচ তৃণমূলের সন্ত্রাসে সন্ত্রস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতপ্রার্থীযুক্ত বুথ, যেখানে এসইউসিআই(সি)-র প্রার্থী, কর্মী-সমর্থকদের উপর তৃণমূলের আক্রমণ চলছে বা বুথ দখল হচ্ছে, সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী দূরের কথা, উপযুক্ত সংখ্যায় সশস্ত্র রাজ্য পুলিশও দেওয়া হয়নি।

তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস-সিপিএম দলের পারস্পরিক বিরোধিতাও অনেক ক্ষেত্রে ভোল বদলে ঐক্যের চেহারা নিয়েছে, বিশেষ করে এসইউসিআই(সি) প্রভাবাধীন এলাকাগুলিতে। কোথাও কাস্তে হাতুড়ির সঙ্গে একই পোস্টার ফ্লেক্সে কংগ্রেসের বেনামি লাঙল বা আম প্রভৃতি চিহ্ন, আবার কোথাও হাত চিহ্নের সাথে ছদ্মবেশী সিপিএম-এর এইসব প্রতীক। এমনকী নারায়ণগড়ের প্রহরাজপুর বুথে তৃণমূল প্রকাশ্যে সিপিএম-কে ভোট দিয়েছে এসইউসিআই(সি)-কে হারাতে।

এতদসত্ত্বেও গ্রামের গরিব মানুষ সাহসিকতার সাথে শত জুলুমের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত হয়েও যেভাবে প্রতিবাদ করেছেন, বিশেষ করে মহিলারা এগিয়ে এসেছেন, সেজন্য এসইউসিআই(সি) পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে কালীগঞ্জ ব্লকে ছাত্র ধর্মঘট

২৯ জুন নদীয়া জেলার পলাশির গোবিন্দপুর গ্রামের চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে স্কুল যাওয়ার পথে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক মদ্যপ যুবক ধর্ষণ করে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তায় অপরাধী ধরা পড়েনি। ঘটনার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। এস ইউ সি আই (সি) নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। ডিএসও, ডিওয়াইও এবং এমএসএস প্রতিনিধিরা ছাত্রীটিকে হাসপাতালে দেখতে যান ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। ১ জুলাই এআইডিএসও কালীগঞ্জ ব্লকে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয় এবং তা সফল হয়। ঐ দিনই পলাশীতে শতাধিক ছাত্রের মিছিল ও পথসভা হয়। ডিএসও-র নদীয়া জেলা সভানেত্রী কমরেড শম্পা শিরিন ও সম্পাদক কমরেড বিমান কর্মকার ধর্মঘট সফল করার জন্য সাধারণ ছাত্রদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে এই ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

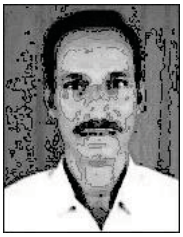

পুরুলিয়া জেলার পাড়া ব্লকের পার্টিকর্মী কমরেড দুর্গা সিং বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর গত ১১ জুন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি দেউলী অঞ্চলে সাতের দশকের শুরুর দিকে এস ইউ সি আই (সি) দলের সাথে যুক্ত হন এবং ওই এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড দুর্গা সিং লাল সেলাম।

নদী বাঁধের বেহাল দশায় আশঙ্কিত গোসাবার মানুষ

গ্রামবাসীদের সঙ্গে ভাঙা বাঁধ পরিদর্শনে সাংসদ তরুণ মণ্ডল

৬ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল গোসাবা ব্লকের বালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরাজনগর মুসলিমপাড়া, গোসাবা অঞ্চলের দুলকি ও সোনাগাঁ, রাঙাবেলিয়া অঞ্চলের দয়াপুর ও রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া অঞ্চলের সাতজেলিয়া পুরাতন বাজার থেকে নতুন বাজার এবং ছোটমোল্লাখালি অঞ্চলের হেতালবাড়ি এলাকার ভাঙা বাঁধগুলি পরিদর্শন করেন। আগামী ২১, ২২, ২৩ জুলাই এ বছরের সবচেয়ে বড় কোটাল হওয়ার কথা। আয়লায় সব হারানো, দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোসাবার মানুষের মনে তাই আবার আতঙ্ক। যেসব জায়গায় নদীবাঁধের অবস্থা খুব খারাপ, সেখানকার মানুষ ডাঃ তরুণ মণ্ডলের কাছে আর্জি জানান, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি যেন প্রশাসনকে উদ্যোগী হতে বলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সাংসদের এই পরিদর্শন। সাংসদ ডাঃ মণ্ডল তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, অবশ্যই তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনকে কোটালের আগেই যাতে বাঁধ মেরামতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সে সম্পর্কে বলবেন।

ফুলবাড়িতে এসইউসিআই (সি)-র নির্বাচনী জনসভা

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের সমর্থনে গত ৪ জুলাই জনসভা অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়িতে। মূল বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। এ ছাড়াও দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য, ফুলবাড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আবুল কাসেম বক্তব্য রাখেন। পাঁচ শতাধিক কর্মী সমর্থক এই জনসভায় অংশ নেন।

উচ্চমাধ্যমিকে বই কেলেঙ্কারির সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে

উচ্চশিক্ষা সংসদ টেন্ডার ডাকার সরকারি নিয়মকে অগ্রাহ্য করে অন্যায়ভাবে পছন্দের প্রকাশনা সংস্থাকে দিয়ে একাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার মধ্য দিয়ে ঐ বিশেষ সংস্থাকে বিপুল মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ৯ জুলাই গোটা প্রকাশনা প্রক্রিয়ার উপর হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করেছে। এদিকে ক্লাস শুরু হয়ে গেলেও লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পাঠ্যপুস্তক না পেয়ে ঘোর অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে। এ আই ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অংশুমান রায় এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবই পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অবিলম্বে উচ্চশিক্ষা সংসদের এই আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা ১১ জুলাই এক বিবৃতিতে উচ্চমাধ্যমিকের বই ছাপানোকে কেন্দ্র করে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতির ন্যক্কারজনক কাণ্ডের নিন্দা করেছেন।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

দ্বিতীয় দফার ভোটেও সন্ত্রাস জোরকদমে

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে বর্ধমানের কেতুগ্রাম ব্লক-১ এ তৃণমূল কংগ্রেস জয়ের জন্য সন্ত্রাসকেই হাতিয়ার করল। এই ব্লকের পাণ্ডুগ্রাম অঞ্চলে খাটুন্দি গ্রামের ১১ ও ১২ নং বুথে এস ইউ সি আই (সি)-র এজেন্টদের মেরে বুথ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তারপর ভোটারদের দিয়ে সই বা টিপসই করে ব্যালট পেপারে তাদের সামনেই তৃণমূলের প্রতীকে ছাপ দিতে বাধ্য করেছে দুষ্কৃতীরা। এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেড অজয় মণ্ডলকে তারা মারধর করেছে। তৃণমূলের জাহির শেখের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতী এক বুথ থেকে আর এক বুথে সন্ত্রাস চালিয়েছে। ঐ ব্লকেরই বেড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ ও ১৪ নং বুথে এস ইউ সি আই (সি) কর্মী কচি মুন্সী ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী গুলজার শেখ এবং জেলা পরিষদ প্রার্থী মফিজুল আলমকে মারধর করা হয়েছে। দুষ্কৃতীবাহিনী দলের বুথ ক্যাম্পেআক্রমণ করে ভোটার লিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। বিরুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২ নং বুথে এস ইউ সি প্রার্থী সাফিয়া বিবি ও তাঁর এজেন্টকে বুথে ঢুকতেই দেয়নি তৃণমূলের আফু শেখ ও তার বাহিনী। একই সন্ত্রাস চালিয়েছে চিনিসপুর গ্রামের ৩২ ও ৩৩ নং বুথে। দলের কাটোয়া লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অপূর্ব চক্রবর্তী জানান, পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশনারকে বারবার জানালেও সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। তথাকথিত নিরাপত্তা বাহিনী কোনও নিরাপত্তাই দিতে পারেনি। সারাদিন ধরে এভাবেই চলেছে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রহসন। এইভাবে অপরাধীরা জিতবে। সুপ্রিম কোর্ট জনপ্রতিনিধিদের কলুষমুক্ত করার কথা যখন বলছে, তখন এভাবে সন্ত্রাসের সূতিকা গৃহে জন্ম নিচ্ছে পঞ্চায়েত স্তরের শাসক দলের 'জনপ্রতিনিধিরা'।

পাশ-ফেল চালুর দাবিতে ভুবনেশ্বরে ছাত্র কনভেনশন

৭ জুলাই ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে উপস্থিত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ বীরেন্দ্র নায়ক, অধ্যাপক এল পি সিং, এ আই ডি এস ও-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী, রাজ্য সভাপতি কমরেড অক্ষয় দাস, রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবাশিস প্রহরাজ সহ বহু ছাত্র ও বিশিষ্ট মানুষ।।

ত্রিপুরায় বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিল টিবিজিএস

অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) মতো বিদ্যুৎ আন্দোলনের সংগ্রামী কমিটি গড়ে উঠল ত্রিপুরায়। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ক্ষমতায় থাকার সময় ক্রমাগত বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে। একইভাবে তারা ত্রিপুরাতেও বাড়িয়ে চলেছে। এর বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে ৪ জুলাই আগরতলা প্রেস ক্লাবে বিদ্যুৎ গ্রাহক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ১০ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক বক্তব্য রাখেন। বক্তারা লোডশেডিং ও মাশুল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সুব্রত চক্রবর্তী এবং সুভাষকান্তি দাসকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ত্রিপুরা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (টিবিজিএস) গঠিত হয়। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ গ্রাহকরা হয়ত বিস্মিত হবেন এ কথা শুনে যে, সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এম ভি সি এ (মাছলি ভ্যারিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট) নামে একটি আইনি অধিকার মালিকদের হাতে দিয়ে গেছে, যার দ্বারা তারা চাইলে মাসে মাসে বিদ্যুতের দাম বাড়াতে পারে। মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য এ হেন ব্ল্যাঙ্ক চেক দেওয়ার ঘটনা তাদের চূড়ান্ত জনবিরোধী চরিত্রকেই তুলে ধরেছে।

'সামাজিক নিরাপত্তা' বিষয়ে
ব্রাসেলসে সেমিনারে কমরেড সি কে লুকোস

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ভারতের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ২৪-২৫ জুন বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে 'সামাজিক নিরাপত্তা' বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের সহ সভাপতি হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সি কে লুকোস এই সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, আই এল ও-র ১০১তম আন্তর্জাতিক অধিবেশনে এ কথা পুনরায় জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, সোস্যাল সিকিউরিটি বা সামাজিক নিরাপত্তা একটি মানবাধিকার। যার অর্থ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান নিয়ে আইন-আদালত চলে না, এটা একটি মৌলিক মানবাধিকার। একটি সংগঠিত সমাজ বলতে তার সকল সদস্যদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বোঝায়।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও ভারতের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ২৪-২৫ জুন বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে 'সামাজিক নিরাপত্তা' বিষয়ে সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন কমরেড সি কে লুকোস

উপরোক্ত আন্তর্জাতিক অধিবেশনে আরও বলা হয়েছিল যে, সমাজের বিকাশ ও প্রগতির জন্য কর্মসংস্থান দেওয়ার পাশাপাশি সমাজের সকলের জন্য আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত জরুরি। এ যেমন সমাজকে স্থিতিশীলতা দেবে, পাশাপাশি অর্থনীতিতে গড় চাহিদারও বৃদ্ধি ঘটাবে।

তিনি বলেন, গত দু'দশক ব্যাপী পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও তার অগ্রযাত্রা বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণের জীবনে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। 'কর্মহীনতা' ও 'কর্মচ্যুতি' এখন বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন। আই এল ও-র ২০১২-১৩-র গ্লোবাল রিপোর্টে বলা হয়েছে, যাদের চাকরিও আছে, তাদের প্রকৃত মজুরি কমছে, যদিও দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকী সংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে অধিকাংশ কাজকে 'কন্ট্রাক্ট' ও 'ক্যাজুয়াল' ব্যবস্থায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে যতটুকু সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল, তাও সরকারি ব্যয়সঙ্কোচের নামে হয় প্রত্যাহার না হয় ছাঁটাই করা হচ্ছে, অথবা ব্যবসা করে বা ফাটকা কারবারে মুনাফার জন্য বাজারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন পেনশন স্কিম, মেডিকেল ব্যবস্থা, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি। চুক্তি বা ঠিকা শ্রমিক প্রথা আইন করে তুলে দেওয়া হলেও, বাস্তবে তা ফিরে এসেছে বহুগুণ শক্তি নিয়ে।

এই অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন, একে অর্থবহ করতে হলে সরকারকে নীতি পাল্টাতে হবে ও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।

আই এল ও-র নতুন সুপারিশে যেভাবে বিশ্বায়নের 'সুফল' সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, তার প্রতিবাদ করে কমরেড লুকোস বলেন, যে বিশ্বায়ন সমগ্র বিশ্বের শ্রমজীবী জনগণকে মুক্ত বাজারের খেলায় হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে তাদের জীবনে বিশ্বায়নের 'সুফল' বলে কিছু থাকতে পারে না। বস্তুত ১৯৫২ সালে আই এল ও-র 'সামাজিক নিরাপত্তা' বলতে যে মানগুলি নির্দিষ্ট করেছিল, সকল সদস্য দেশকে তা অনুসরণ করতে বলা হোক। আমি সমগ্র বিশ্ব ধরেই বললাম, কারণ দেশভেদে আজ আর অবস্থার তেমন পার্থক্য নেই।

পরিশেষে কমরেড লুকোস বলেন, অনেক সময়ই বলা হয় ভারত একটি গরিব দেশ এবং বিপুল জনসংখ্যাই এখানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়ার পথে বাধাস্বরূপ। আমি একমত হতে পারছি না। বাস্তবে ভারত একটি বিরাট সম্পদশালী দেশ। বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ, নদীসম্পদ ও জীববৈচিত্রে পূর্ণ এ দেশ। দক্ষতা, গুণমান, প্রতিভা কোনও বিষয়েই ঘাটতি নেই ভারতে। ভারতের বিশাল জনসংখ্যা, কর্মে নিয়োজিত হলে বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম। ফলে, জনসংখ্যা অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ। একইভাবে অবসরপ্রাপ্ত ও বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উদ্বেগের বিষয় হতে পারে না। কারণ, এদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমাজের পক্ষে সম্পদ হিসাবে কাজ করতে পারে।

দুর্ভাগ্যের কথা যে, এত সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও ভারতে বিশ্বের মোট গরিব মানুষের প্রায় অর্ধেক বাস করে। মানবসম্পদ সূচক অনুযায়ী বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩৪। গত এক দশক ধরে এই পরিস্থিতিই চলছে। সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার সময় এই বাস্তব অবস্থাটা আমাদের খেয়ালে রাখা দরকার।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in